সাহিত্য দীপিকা

২য় ভাগ



প্রকাশক :
শ্রীবিমলা রঞ্জন চন্দ্র
কলিকাতা-৭০০০১২

(সংশোধিত সংস্করণ—১৯৭৭)

মূল্য : [redacted]।

মুদ্রাকর :
শ্রীমধুমঙ্গল পাজা
নিউ সুধীরনারায়ণী প্রেস
১৬, মার্কাস লেন, কলিকাতা-৭

॥ সূচীপত্র ॥

* গদ্যাংশ *

* পদ্যাংশ *



জাতীয়তাবোধ

[ভাষা ও ভাবের বলিষ্ঠতা এবং উদ্দীপক প্রকাশভঙ্গীর প্রসাদে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বহু বিচিত্র বিষয়ে তিনি লিখেছেন, আর বিষয়-অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের ভাষাও ব্যবহার করেছেন সার্থকতার সঙ্গে।]

বর্তমান ভারতের আর এক সমস্যা—পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ। কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, "বুঝি কোন ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতেই সে এত প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমন প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি-বিচার শাস্ত্র-বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য! ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি

সম্পূর্ণ ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র ? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।"

যে ব্যক্তির বা সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। শিখিবার আছে, কিন্তু ভয়ও আছে।

হে ভারত,—পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাস-সুলভ দুর্বলতা—এই সকল ঘৃণিত, জঘন্য, নিকৃষ্ট সম্বল লইয়া তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ?

হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত। তোমার সমাজ, সে বিরাট, মহামায়ার ছায়া মাত্র ; নীচ! জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধ্যকের বারাণসী ; বল ভাই —ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা—কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

[— স্বামী বিবেকানন্দ]

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। স্বামীজী ভারতের কি সমস্যার কথা বলেছেন?

২। ভালো-মন্দ নির্বিশেষে পাশ্চাত্যের সব কিছু থেকে আমরা কি মুখ ফিরিয়ে থাকব?

৩। দেশকে বড়ো করে তুলতে হলে কী করতে হবে?

৪। পদ-পরিবর্তন কর :—মোহ ; পতিত ; ঘৃণিত।

৫। লিঙ্গ-পরিবর্তন কর :—মেথর ; পণ্ডিত ; উপাস্য ; চণ্ডাল।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—পাশ্চাত্য ; প্রশংসা ; নিকৃষ্ট ; মূর্খ ; অজ্ঞ।

৭। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—শ্বেতাঙ্গ ; নিশ্ছিদ্র ; পরানুকরণ ; উচ্চাধিকার।

৮। শব্দার্থ দাও :—বিভীষিকা ; নিষ্পন্ন ; মোহ ; নিশ্ছিদ্র ; সম্বল।

৯। টীকা লেখ :—সীতা ; সাবিত্রী ; দময়ন্তী ; উমানাথ ; শঙ্কর ; শাস্ত্র।

১০। ব্যাখ্যা কর :—(ক) "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।"
(খ) "...ভারতের সমাজ...বার্ধক্যের বারাণসী।"

১১। 'পরানুবাদ', 'পরানুকরণ' এবং 'পরমুখাপেক্ষা'—এই তিনটি শব্দ নিবন্ধে পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দগুলিকে অর্থ অনুযায়ী নিচের ছকে যথাস্থানে বসাও :—

নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করে কেবলই পরের উৎকর্ষের কথা কীর্তন করা। (এই নিবন্ধের বক্তব্য অনুযায়ী)	
পরের নকল করা।	
পরের উপর নির্ভর করা বা মুখ চেয়ে থাকা	

আমার স্কুল-জীবন



[সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'ভারত-পথিক' গ্রন্থ থেকে তাঁর স্কুল-জীবনের স্মৃতিকথাটি সংক্ষেপিত আকারে সঙ্কলিত হলো।]

তখন ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাস। আমার পাঁচ বছর পূর্ণ হতে তখনো কিছু বাকি, এমনি সময়ে একদিন শুনলাম আমি নাকি স্কুলে ভরতি হব। খবর পেয়ে আমি তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। দিনের পর দিন চোখের উপর দেখতাম দাদা দিদিরা সেজেগুজে স্কুলে যেত—ছোট বলে আমিই শুধু বাড়িতে পড়ে থাকতাম—এতে মেজাজ বিগড়ে যেত। কাজেই স্কুলে যাবার নামে আমি নেচে উঠলাম।

যে দিন প্রথম স্কুলে যাবার কথা সেদিনটির কথা আজও আমার মনে আছে। শেষটায় আমিও বড়দের মতো স্কুলে যেতে পারবো, শুধু ছুটির দিন ছাড়া বাড়িতে থাকবো না! স্কুল বসত ঠিক দশটায়, কাজেই দশটার একটু আগেই আমাদের রওনা হতে হবে। আমারই বয়সী আমার দুজন কাকারও সে দিন ভরতি হবার কথা ছিল। সবাই প্রস্তুত হয়ে নিয়ে গাড়িতে ওঠবার জন্য মাত্র ছুট্ লাগিয়েছি, এমন সময়ে পা পিছলে এক বিশ্রী রকম আছাড় খেলাম। মাথায় চোট লেগেছিল, কাজেই ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে সেদিনকার মতো আমাকে শয্যাশায়ী থাকতে হল। আমার কাকাদের ভাগ্য ছিল ভালো, ওরা দিব্যি স্কুলে চলে গেল, আর আমি ভগ্নহৃদয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইলাম।

পরের দিন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

আমার অন্য ভাইবোনেরাও এই স্কুলেই পড়ত, কাজেই আমিও এখানে ভরতি হলাম। বেছে বেছে এই স্কুলেই আমাদের কেন ভরতি করা হয়েছিল জানিনে, হয়তো অন্য সব স্কুলের চাইতে এখানে ইংরিজিটা তাড়াতাড়ি এবং ভালো শেখা যেত বলেই—আর তখনকার দিনে ইংরিজি-জ্ঞানের বিশেষ কদরও ছিল। এখনো মনে আছে ভরতি হবার সময়ে আমার ইংরিজি বিদ্যের দৌড় বর্ণপরিচয়ের বেশি ছিল না। একটাও ইংরিজি কথা না জেনেও আমি কি করে যে চালিয়ে নিতাম এখন ভাবলে আশ্চর্য মনে হয়। প্রথম প্রথম ইংরিজি বলতে গিয়ে যে কী বিভ্রাট হত ভাবলে হাসি পায়। একটা ঘটনা মনে পড়ে। একবার আমাদের সকলের হাতে একটি করে স্লেট পেনসিল দিয়ে আমাদের শিক্ষয়িত্রী বলেছেন সেগুলোকে ছুঁচোলো করে নিতে। আমি দেখলাম কাকার চাইতে আমার পেনসিলটা বেশি ছুঁচোলো হয়েছে—অমনি ইংরিজিতে শিক্ষয়িত্রীকে সেটা জানিয়ে দেবার জন্য বললাম—"রণেন্দ্র মোট, আই শোর" বলেই মনে মনে নিজের ইংরিজি-জ্ঞানের তারিফ না করে পারলাম না।

অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্র-ছাত্রী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হলেও আমাদের স্কুলটা ছিল বিলিতী ছাঁচে গড়া এবং যতদূর সম্ভব বিলিতী-ভাবাপন্ন। পড়ার চাইতে বেশি মনোযোগ দেওয়া হতো ভদ্র আচরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুবর্তিতার উপরে—দেশী স্কুলে যার একান্ত অভাব। পড়াশুনার ব্যাপারেও প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া হতো, রোজকার পড়া নিয়মিত-ভাবে শেখানো হতো। রোজকার পড়া এইভাবে হয়ে যাওয়ার ফলে পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়বার দরকারই হত না।

কিন্তু এত সব সুবিধে সত্ত্বেও ভারতীয় ছেলেদের পক্ষে এরকম

স্কুলে পড়া ভালো কিনা বলা মুস্কিল। এই জাতীয় স্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ হলেও, যে শিক্ষা এখানে দেওয়া হতো ভারতীয়দের দিক থেকে তার উপযোগিতা বিশেষ ছিল না।

আমাদের পাঠ্যতালিকা এমনভাবে তৈরি হতো যাতে মনে-প্রাণে আমরা ইংরেজ হয়ে উঠতে পারি। গ্রেট বৃটেনের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে আমার যতখানি জ্ঞান ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে তার সিকি ভাগও ছিল কিনা সন্দেহ। ভারতীয় নামও আমরা উচ্চারণ করতাম বিদেশীদের মতো বিকৃতভাবে। পাঠ্য বইয়ে পড়তাম ওদেশের ইতিহাসের গল্প, রূপকথা—নিজেদের দেশের ছিটেফোঁটাও তাতে থাকত না। বলা বাহুল্য দেশী কোনো ভাষাই সেখানে শেখানো হতো না। আমারাও দেশী স্কুলে ঢোকবার আগে পর্যন্ত মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়েই বেরিয়েছি।

১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমি যখন কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে ভরতি হলাম, আমার মনের মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটল। য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের কাছে আমার বংশমর্যাদার কোন মূল্য ছিল না, কিন্তু ভারতীয় ছেলেদের ক্ষেত্রে তার উল্টোটাই দেখা গেল। তাছাড়া অন্য সকলের চাইতে আমার ইংরিজি-জ্ঞান বেশি থাকার দরুণ সকলেই আমাকে অত্যন্ত সমীহ করে চলত। প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় সত্যিই আমি প্রথম হলাম। নতুন এই পরিবেশে এসে প্রথম অনুভব করলাম আমি নেহাৎ অগণ্য নই। এই মনোভাবকে অহঙ্কার না বলে আত্মপ্রত্যয় বললেই ঠিক বলা হবে। এতদিন পর্যন্ত আমার মধ্যে এই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল—যে আত্মপ্রত্যয়ের জোরে মানুষ জীবনে সফলতা লাভ করে।

এবার আমাকে আর ইনফ্যাণ্ট ক্লাসে ভরতি হতে হল না, আমি ভর্তি হলাম গিয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে। চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেরা নিজেদের উঁচু শ্রেণীর ছাত্র বলেই মনে করত এবং বেশ ভারিক্কি চালে চলাফেরা

করত। আমিও তাদের দলেই ছিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাকে কাবু করে রেখেছিল। এই স্কুলে ভরতি হবার আগে আমি বাঙলা এক বর্ণও পড়িনি। এদিকে আমার সহপাঠীরা সকলেই বাঙলায় বেশ পাকা ছিল। মনে পড়ে প্রথম দিন আমি 'গোরু' (না ঘোড়া?) সম্বন্ধে বাঙলায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, আর সেই রচনা নিয়ে ক্লাসে সে কি হাসাহাসি! ব্যাকরণ বা বানান সব কিছুতেই আমি দিগ্‌গজ ছিলাম। শিক্ষকমশাই যখন টীকাটিপ্পনী সহকারে ক্লাসের সকলকে আমার অপূর্ব রচনাখানি পড়ে শোনালেন, তখন চারিদিকে এমন হাসির ধুম পড়ে গেল যে লজ্জায় আমি প্রায় মাটিতে মিশে গেলাম। এর পর বহুদিন পর্যন্ত বাঙলা ক্লাসের নামেই আমার জ্বর আসত। মনে মনে তখন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বাঙলা আমি শিখবই। ধীরে ধীরে বাঙলায় বেশ উন্নতি করতে লাগলাম এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় যখন বাঙলায় আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেলাম, তখন আমার আনন্দ দেখে কে!

[—সুভাষচন্দ্র বসু]

অনুশীলনী

১। তখনকার দিনের বিদেশীভাবাপন্ন স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার কোন ত্রুটির কথা সুভাষচন্দ্র উল্লেখ করেছেন? তিনি কিছু গুণের কথাও উল্লেখ করেছেন—সেগুলি কি?

২। র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হওয়াতে সুভাষচন্দ্রের কি লাভ হল?

৩। র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে কোন ব্যাপারটি তাঁকে 'কাবু' করে রেখেছিল? কিভাবে এবং তার কতখানি সুরাহা করেছিলেন তিনি?

৪। পদ-পরিবর্তন কর :—বাহুল্য; বিকৃত।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—সফলতা; বিশ্রী।

৬। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—মনোবাঞ্ছা; সময়ানুবর্তিতা; ভাবাপন্ন।

৭। শব্দার্থ দাও :—আত্মহারা; ভগ্নহৃদয়ে; সময়ানুবর্তিতা; বিভ্রাট; বিকৃত; সমীহ; নগণ্য; উপযোগিতা।

৮। টীকা লেখ :—দিগ্‌গজ; অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

৯। নিচের বাক্যগুলির তলায়-দাগ-দেওয়া শব্দগুলি 'রওনা-হওয়া', 'চোট', 'কদর' এবং 'কাবু' শব্দের সমার্থক সাধু ভাষার রূপ। শব্দগুলি নিচের বাক্যগুলিতে যথাস্থানে যথাযোগ্যভাবে বসাও :—

(ক) আজকাল শিক্ষা-দীক্ষার চেয়ে ধন-দৌলতের সমাদর বেশি।
(খ) গোছগাছ করে তারা স্টেশনের দিকে যাত্রা করল।
(গ) পড়ে গিয়ে তাঁর মাথায় বেশ আঘাত লেগেছে।
(ঘ) তিন দিনের জ্বরেই আমায় একেবারে নিস্তেজ করে ফেলেছে।

১০, ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "এই জাতীয় স্কুলের······উপযোগিতা বিশেষ ছিল না।"
(খ) "এই মনোভাবকে অহঙ্কার না বলে আত্মপ্রত্যয় বললেই ঠিক বলা হবে।"

An interesting ~~picture~~ of Netaji's early school days.



দিবাবসান

[বিভূতিভূষণ (১৮৯৪—১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক। পল্লীজীবন এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা নিয়েই তাঁর অধিকাংশ রচনা। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'ইছামতী' ইত্যাদি উপন্যাসের জন্য তিনি বিশেষভাবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ছোটদের জন্যও অনেক গল্প ও কিছু উপন্যাস তিনি লিখে গেছেন। তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসতেন, তাই তাঁর রচনায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতিও পাশাপাশি ঠাঁই পেত। লেখক হিসাবে এটা তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য।]

যে কটা জিনিস আমার ভাল লাগছিল তার মধ্যে প্রধান একটা হচ্ছে চারিধারের নির্জনতা—যে দিকে চাই, কোন দিকে কাউকে চোখে

পড়ে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, গাছ-পালার সমাবেশে প্রকৃতির কোন দৈন্য চোখে পড়ছিল না—বনে, ঝোপে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে, খড়ে, ঘাসে অযত্নসজ্জিত প্রকৃতির বন্য সৌন্দর্য। এই আছে, তার পেছনে আরও, তার পেছনে আরও, দূরে দূরে আরও নানা রকমের বন-ঝোপের সমাবেশ, ঠাসাঠাসি, অগাধ সবুজ সমুদ্রে জট পাকিয়ে আছে। ইচ্ছামত যত ইচ্ছা দেখতে পারি, ফুরিয়ে যাবে না, মানুষের হাতে বাছাই করে পোঁতা দু-দশ রকমের শখের গাছ নয়। একটা উঁচু ঢিবির ওপরে নানাজাতীয় গাছ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে—একটা সাঁইবাবলা গাছ, তলায়—আধশুক্‌নো উলু-খড়, কাঁটাওয়ালা বৈঁচি গাছ, আসশেওড়া, ভাঁট, কচু, ওল, বিছুটিলতা—সবগুলো জড়িয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। ঢিবিটার ওপর উঠে নোনা গাছটার ছায়ায় একটু বসলুম। এমন শান্তি অনেক দিন অনুভব করিনি—চারিদিকে চেয়ে শান্তি—কেউ কোন দিকে নেই। আর গাছগুলোর দিকে চেয়ে মহাশান্তি এই যে, সেগুলো মানুষের হাতে পোঁতা নয় আদৌ—সম্পূর্ণ বনজ, একেবারে খাঁটি নিখুঁত বনজ। তলায় একেবারে শুয়ে পড়লুম। আঃ, কি আরাম! হলদে ফুলে-ভরা বিছুটিলতা মাথার ওপরে দুলছে, বাতাস লেগে শুকনো সাঁই-বাবলার পাতা ঝর-ঝর করে বুকের ওপর ঝরে পড়ছে। দুর্গা-টুনটুনি পাখী একেবারে কানের কাছে শেওড়ার ডালে বসে কুচকুচ করছে।

বেলা পড়ে যাচ্ছে দেখে নোনা গাছের তলা থেকে উঠলুম। মাঠের মধ্যে তখন গাছপালার দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া পড়ে গেছে, বাবলা বনের ওপর সূর্য হেলে পড়েছে। চলতে চলতে আর একটা ঝোপের মাথা থেকে একটা বেগুনে রঙের অজানা বনফুল তুলে নিলুম। তার গর্ভকেশরের চারিপাশে ছোট ছোট লাল লাল পিঁপড়েয় ভরা, তাদের সর্বাঙ্গ ফুটন্ত ফুলের পরাগে মাখামাখি,—মধু খেতে এসে তারা গাছের কি মহৎ উপকার করে যাচ্ছে! চেয়ে দেখলুম সে রকম গাছ

চারিপাশে আরও অনেক। সবগুলোতেই ফুল ফুটে আছে। ঝোপের মাথায় হলদে-পাখা প্রজাপতি উড়ছে। এই সব ছোট ছোট পোকা-মাকড়, প্রজাপতি আর এই অখ্যাত অজ্ঞাত উদ্ভিদ-জগৎ পরস্পর অদ্ভুত কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ, পরস্পরের উপর নির্ভর করছে। গাছপালা কঠিন মাটি থেকে, বায়ুমণ্ডল থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজের দেহের মধ্যে অদ্ভুত কৌশলে খাদ্য তৈরী করছে প্রাণী-জগতের জীবনধারণের জন্যে—ওগুলো তো প্রাণী-জগৎকে খাদ্য জোগাবার একপ্রকার যন্ত্র। প্রাণী-জগৎ কত রকমে তাদের বংশবৃদ্ধির সাহায্য করছে; আর সকলে মিলে নির্ভর করে আছে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরবর্তী ঐ অগ্নিকুণ্ডটার ওপর। এই পাখী, এই প্রজাপতিটা, এই ফুল, এই তুচ্ছ কি গাছটা, এই লতা, এই আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, ঐ যে উজ্জ্বল হয়ে আসছে চাঁদটা, এই চারিধার, এই প্রাণী-জগৎ, ঐ লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য, ঐ অনন্ত মহাব্যোম, এই বিপুল বিশাল অচিন্তনীয় অসীমতা, সবগুলোর মধ্যে পরস্পর কি আশ্চর্য নাড়ীর যোগ! কি বিপুল রহস্যে ভরা তাদের এই পরস্পর-নির্ভরতা!

মাঠের সামনে গ্রাম পড়ল। অড়হর ক্ষেতের চারিধারে ধঞ্চে গাছের বেড়া দিয়েছে। ওধারে ভুর-ভুর করে কোথা থেকে ফুটন্ত সরষে ফুলের গন্ধ আসছে। এদিকে বেড়ার গায়ে ক্ষুদে ক্ষুদে ফুল ফুটে বেড়া আলো করে রেখেছে, গন্ধটায় বড় ঝাঁঝ। মাঝে মাঝে নাটা ফলের থোলো শুকিয়ে আছে। এক ঝাড় পাথরকুচি গাছের পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে, তাদের পাতাগুলো সিঁদুরের রং হয়ে উঠেছে। একটা ঘন আলকুশি লতার ঝোপের মধ্যে থেকে শীতের বৈকালের ঠাণ্ডা গন্ধের সঙ্গে কি একটা ফুলের তীব্র ঘন সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে…, মাথার ওপর দিয়ে আকাশ বেয়ে এক ঝাঁক বালিহাঁস বাসার দিকে উড়ে চলেছে……।

পাড়া পার হয়ে একটা বাঁশ-বাগান পড়ল। তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা। মচ্ মচ্ করে শুকনো বাঁশ পাতার রাশ ও বাঁশের খোলা জুতোর

নীচে ভেঙ্গে যেতে লাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছ-পালা-লতা-ঝোপের ঘন সমাবেশ, কি বিরাট প্রাচুর্য ! জীবনের কি প্রবল উচ্ছ্বাস! সমস্ত ঝোপটার মাথা জুড়ে সাদা সাদা তুলোর মতো রাধালতার ফুল ফুটে রয়েছে। সমস্ত ঝোপটির কি সম্মিলিত সুগন্ধ, কি স্নিগ্ধ স্পর্শ ! এইবার গ্রামের শেষে কাঁওড়াপাড়া। ছোট্ট ছোট্ট চালাঘর, একটার উঠোনে শুকনো লতাপাতা জ্বেলে অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে আগুন পোয়াচ্ছে। বাড়ির পিছনে খেজুর গাছে ভাঁড় ঝুলানো। বাড়ির মধ্যে সীম গাছ, পুঁই গাছ, লাউ গাছের মাচা। তিন-চারটে কুকুর জুতোর শব্দে ছুটে এসে নতুন লোক দেখে বেজায় ঘেউ-ঘেউ আওয়াজ শুরু করে দিল। সরু পথ বেয়ে আবার গ্রামের পিছনের মাঠে এসে পড়লুম।

[—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। দিবাবসানের শান্ত নির্জন প্রকৃতির রূপটি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। মানুষের হাতে-গড়া উদ্যান আর গাছপালার স্বাভাবিক সমাবেশের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩। "মধু খেতে এসে তারা গাছের কি মহৎ উপকার করে যাচ্ছে !"—এ কথার তাৎপর্য কি ?

৪। "কি বিপুল রহস্যে ভরা তাদের এই পরস্পর-নির্ভরতা !"—কেন এ কথা বলা হয়েছে ?

৫। "...লক্ষ লক্ষ মাইল দূরবর্তী ঐ অগ্নিকুণ্ডটার ওপর।"—অগ্নিকুণ্ড বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে ?
"সকলে মিলে নির্ভর করে আছে..."—কেমন করে ? বুঝিয়ে দাও।

৬। পদ-পরিবর্তন কর :—দৈন্য ; সুগন্ধ ; সমুদ্র।

৭। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—স্নিগ্ধ ; দীর্ঘ।

৮। শব্দার্থ দাও :—অচিন্তনীয় ; সমাবেশ ; উচ্ছ্বাস।

৯। টীকা লেখ :—মহাব্যোম।

১০। নিচের শব্দগুলির সমার্থক শব্দসমূহ বল :—সূর্য ; বন ; চাঁদ ; বাতাস।

A nice picture of natural beauty.



জগদীশ চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

[স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আচার্য জগদীশচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তী-কালে 'শ্রীনিকেতন' তথা 'বিশ্বভারতী'তে যোগ দেন এবং রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। বিভিন্ন বিষয়ে সহজবোধ্য নিবন্ধ-রচনা এবং পত্রিকা-সম্পাদনা ছাড়াও রবীন্দ্ররচনার বহু সঙ্কলন-গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন।

* * * উদ্ভিদের প্রাণ আছে, একথা অজানা ছিল না। আচার্য জগদীশচন্দ্র সেই প্রাণের এমন সব লক্ষণের কথা বললেন, এবং উদ্ভিদের এমন সব অনুভূতি ও সাড়া দেবার ক্ষমতার কথা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যন্ত্রযোগে প্রমাণ করলেন, যা আগে কেউ জানত না। বিনা তারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাবার যে কৌশলের দৌলতে আজকের বেতার-প্রেরণ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে, সেই কৌশল উদ্ভাবনে তিনি যে আদি আবিষ্কারকের মর্যাদা দাবি করতে পারতেন, সে কথা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি।]

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্স-ওয়েল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, যে ঈথর-তরঙ্গ দ্বারা আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি হয়, বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ সেই ঈথরের মধ্য দিয়াই পরিচালিত হইতে পারে। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা নয়, বিজ্ঞানকে গণিতের গণ্ডির মধ্য ফেলিয়া ম্যাক্সওয়েল

হইলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে হার্জ যন্ত্রসহযোগে ম্যাক্সওয়েলের তথ্য অনুযায়ী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া বিজ্ঞানীমহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ইহার দুই বৎসর পূর্বে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলেজে তাঁহার ক্লাসে ছাত্রদিগকে হার্জের এই সব পরীক্ষা দেখাইতে লাগিলেন।

পৃথিবীর উপর বায়ু অল্পদূর গিয়া শেষ হইয়াছে, কিন্তু কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য-নক্ষত্র-তারকা হইতে আমরা আলো পাইতেছি। কী রূপে? বিজ্ঞানী কল্পনা করিলেন যে, জল স্থল বায়ু পরিব্যাপ্ত হইয়া এবং যেখানে জল স্থল বায়ু নাই সেই মহান্ শূন্য স্থানও ব্যাপিয়া একটা কিছু আছে। ইহার নাম দেওয়া হইল ঈথর। এই ঈথর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা গেল না, শুধু এইটুকু ধরিয়া লওয়া হইল যে ইহা কাঁপে। তরঙ্গ উত্থিত হইলে সেই তরঙ্গ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলে এবং এই তরঙ্গ আমাদের চোখে পড়িয়া আমাদিগের আলোকের অনুভূতি জাগায়; কিন্তু এখানে একটা কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেমন বায়ুর কম্পন-সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হইলে তবেই উহা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দের অনুভূতি জাগায়, তেমনি ঈথরের সকল কম্পন দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোক-রূপে প্রতিভাত হয় না; কম্পন-সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হইলে তবেই উহা আমাদিগের নিকট আলোক বলিয়া মনে হয়। সেকেণ্ডে চারিশত লক্ষ কোটি কম্পন লাল আলো বলিয়া মনে হয়, ইহার দ্বিগুণ-সংখ্যার কম্পন বেগুনী আলো বলিয়া প্রতিভাত হয়, অন্যান্য রঙের আলোকের কম্পন-সংখ্যা এই দুই সীমার মধ্যে। কম্পন-সংখ্যার পরিবর্তে যদি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হিসাবে প্রকাশ করা যায় তো লাল রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইল একটা ইঞ্চির পঁচিশ ভাগের এক ভাগ,

আর বেগুনী রঙের ইহারও অর্ধেক। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইল দুইটি পর পর তরঙ্গের মাথার মধ্যে দূরত্ব।

হার্জ তড়িতের সাহায্যে ঈথর-তরঙ্গ উৎপন্ন করিলেন। যে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কয়েক শত গজ। কিন্তু এ তরঙ্গ তো চোখে দেখা যাইবে না; এই অদৃশ্য আলোকের অস্তিত্ব তবে কিরূপে জানা যাইবে? হার্জ তাহারও এক ব্যবস্থা করিলেন। বিজ্ঞানের এক নতুন দিক হার্জ খুলিয়া দিলেন; কিন্তু খুলিয়া দিয়া বেশিদূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পরের অধ্যায় আরম্ভ করিলেন জগদীশচন্দ্র।

আলোকের কতকগুলি ধর্ম আছে। হার্জ যে তরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন উহা যদি দৃশ্য আলোকের সমগোত্রীয় হয় তো দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোক এক ধর্মীয় হইবে। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোকের শ্রেণীগত অভিন্নতার আর এক প্রমাণ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। হার্জ যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহার দৈর্ঘ্য ২০০—৫০০ মিটার। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যদি অদৃশ্য আলোক হয় তবে সে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমপর্যায় হওয়া উচিত। জগদীশচন্দ্র যে তরঙ্গ সৃজন করিলেন তার দৈর্ঘ্য চার মিলিমিটার, দৃশ্য আলোকের পরবর্তী তাপ-তরঙ্গের একেবারে ঠিক প্রান্তবর্তী। চার মিলিমিটারের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে নামাইয়া আনাতে সকল সংশয় দূরীভূত হইল।

দৃশ্য আলোক ও বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যে এক জাতীয় জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নিঃসংশয়রূপে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

আলোক বিনা তারে বার্তাবহন করে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিনা তারে কেন বার্তা বহন করিবে না?

যে কৃত্রিম চক্ষু জগদীশচন্দ্র নির্মাণ করিলেন তাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পড়িলে একটি বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়, তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্রের কাঁটা ঘুরিয়া যায়। কিন্তু এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ তো কাঁটা না ঘুরাইয়া বৈদ্যুতিক

ঘণ্টা বাজাইতে পারে, বারুদের স্তূপে আগুন ধরাইতে পারে। অধিকন্তু ইটপাটকেলের মধ্য দিয়া যখন এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যায় তখন মধ্যের দেওয়াল ভেদ করিয়া তো পার্শ্ববর্তী ঘরে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধাবিত হইতে পারে ; আর জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত কৃত্রিম চক্ষু তো খুবই কার্যকর, অত দূরে থাকিয়াও তো উহা সাড়া দিবে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উদ্ভূত হইল, মধ্যে দরজা বন্ধ, সে দরজা রক্ষা করিতেছেন জগদীশচন্দ্রের পূর্বতন অধ্যাপক সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজের ফাদার লাফোঁ; ঘর ভেদ করিয়া পার্শ্ববর্তী অধ্যাপক পেড্‌লারের ঘরে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পৌঁছিয়া একটি পিস্তল ছুঁড়িল।

পৃথিবীতে বিনা তারে বার্তা প্রেরণের এই হল সূচনা। এ বিষয়ে তিনি যে মার্কনির পূর্বগামী তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং জগদীশচন্দ্রকে লিখিত অধ্যাপক লাফোঁর পত্রের এই অংশ সেই সত্যকে বিঘোষিত করিয়াছে—

"প্রিয় জগদীশ—

সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজ হলে 'বিনা তারে বার্তা প্রেরণ' সম্বন্ধে আমার একটি বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা—কিন্তু তুমি দয়া করিয়া যে সব যন্ত্রপাতি আমায় দিয়াছিলে, সেগুলি ঠিক কার্যকর অবস্থায় নাই। তুমি যে মার্কনির পূর্বগামী, এই প্রকৃত সত্য প্রমাণ করিতে চাই। নিজে উপস্থিত থাকিয়া এবং তোমার নিজের যন্ত্রপাতি চালাইয়া আমার বক্তৃতায় সাহায্য করিতে পারিবে কি ? যথাশীঘ্র জানাও, লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নরকে আমন্ত্রণ করিতে চাই * * *"

জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার-কাহিনী সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচারিত হইল এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে জগদীশচন্দ্র যে পরীক্ষা দেখাইলেন

তাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দুইটি রুদ্ধ ঘর ভেদ করিয়া ৭৫ ফুট দূরে তৃতীয় ঘরে পৌঁছিল এবং সেখানে একটি লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদ-স্তূপ উড়াইয়া দিল। ৭৫ ফুট দূরে পাঠাইতে তিনি তাঁহার যন্ত্রের সহিত একটি উচ্চ দণ্ড সংযুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেই দণ্ডের উপরিভাগে একখণ্ড টিনের চাকতি আটকাইয়া রাখিলেন। বর্তমান যুগে পরিবর্তিত আকারে এরিয়াল-এ এই ধরনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইবার তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এক মাইল দূরে তাঁহার বাসভবনে বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ পাঠাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু অবিলম্বে তাঁহাকে বিদেশ যাত্রা করিতে হইল।

হার্জের পর পাশ্চাত্য দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ ধরিবার নানারূপ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র সবার শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ইলেকট্রিশিয়াম্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল—

"বর্তমান সময়ে বিনা তারে বার্তা প্রেরণ করিবার যতগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে জগদীশচন্দ্র বসু-আবিষ্কৃত যন্ত্র তাহাদের সকলকে হটাইয়া দিল।"

এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সার্ হেনরি জ্যাকসন ছিলেন তখন বৃটিশ রণতরীর অধ্যক্ষ। তিনি অনেক দিন হইতে ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া বিনা তারে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে সংবাদ পাঠানো যায়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার কথা অবগত হইলেন এবং তাহা কাজে লাগাইতে চেষ্টিত রহিলেন। অবশেষে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্র দ্বারা জাহাজের এক ধার হইতে অপর ধারে সংবাদ পাঠাইলেন। মার্কনি-প্রবর্তিত যন্ত্র ইহার পরে দেখা দিল।

১৮৯৭ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারী ইলেকট্রিক এন্‌জিনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত হইল—

"যে সকল যুক্তির ধারা অবলম্বনে অধ্যাপক বসু বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ ধরিবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, সেই যুক্তি, এবং সকল যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক বসুর যন্ত্র যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, এই সত্য অতিশয় চমকপ্রদ। আশ্চর্য এই যে, এই যন্ত্র নির্মাণের কৌশল তিনি কোনোদিন লুক্কায়িত রাখেন নাই এবং পৃথিবীর লোকের এই যন্ত্র কাজে লাগাইতে এবং তদ্দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে কোন বাধা নাই।"

ইহার পর জগদীশচন্দ্রের গবেষণা অন্য দিকে চলিয়া গেল এবং তাঁহার আবিষ্কার-কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল।

[—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য]

(সংক্ষেপিত)

['বার্তা' বলিতে এই নিবন্ধে খবর বা সংবাদ বুঝাইতেছে না ; কোনও ক্রিয়া-সংকেত বা নির্দেশ বুঝাইতেছে। তখনও বেতারের সাহায্যে মানুষের স্বর প্রেরণের কথা ভাবা হয় নাই।

ইতালির যে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, মার্কনি সাহেবের নাম বেতারের উদ্ভাবক হিসাবে সাধারণতঃ সুপরিচিত, তিনিও নিজ কৃতিত্বে বেতার-ব্যবস্থার উপায় বাহির করিয়াছিলেন ১৮৯৫ সালে অর্থাৎ জগদীশচন্দ্রের সাফল্যের খুবই কাছাকাছি সময়ে। বেতার-ব্যবস্থার উপযোগিতা অনুমান করিয়া ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেতারযন্ত্রকে সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন অবশ্য মার্কনি-ই]

অনুশীলনী

১। "পরের অধ্যায় আরম্ভ করিলেন জগদীশচন্দ্র"—ভালভাবে বুঝিয়ে দাও।

২। "......সকল সংশয় দূরীভূত হইল"—কোন সংশয়? কিভাবে দূর হলো?

৩। বেতার-ব্যবস্থার উদ্ভাবনে যে জগদীশচন্দ্র মার্কনির পূর্বগামী, তার কয়েকটি প্রমাণের কথা বল। তিনি যে তাঁর উদ্ভাবনের তথ্য ও কৌশল গোপন রাখতে চাননি, সেই সম্পর্কে তথ্য দাও।

৪। পদ-পরিবর্তন কর :—কম্পন ; অনুভূতি ; যন্ত্র ; বিদ্যুৎ ; দৈর্ঘ্য ; পৃথিবী।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—কল্পনা ; অগ্রসর ; পরবর্তী।

৬। শব্দার্থ দাও :—অনুভূতি ; প্রতিভাত ; কৃত্রিম ; সমগোত্রীয়, সংশয়।
৭। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—শ্রবণেন্দ্রিয় ; গবেষণা।
৮। "পূর্বগামী" ও "পূর্বতন" এই দুই শব্দ ব্যবহার করে এমন দুটি বাক্য রচনা কর, যাতে অর্থের পার্থক্য স্পষ্ট হয়।
৯। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :—খ্যাতনামা ; সৃষ্টি ; নিযুক্ত ; স্মরণ ; নির্দিষ্ট।
১০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—"জগদীশচন্দ্র— —কৃত্রিম চক্ষু তো— —, অত দূরে—তো উহা—দিবে।"

The story of a scientific discovery



বৈবস্বত মনি

[উপেন্দ্রকিশোর (১৮৬৩—১৯১৫) একাধারে কবি, সঙ্গীত-রচয়িতা, বেহালাবাদক, শিল্পী ও শিশু-সাহিত্যিক ছিলেন। এঁর উদ্ভাবিত হাফ-টোন ব্লক ছাপার নতুন নিয়ম বিলেতেও প্রশংসা লাভ করেছিল। এঁর পুত্র সুকুমার রায়ের ও পৌত্র সত্যজিতের লেখা ও ছবির কথা সকলেই জানে। তাঁর প্রকাশিত রচনার মধ্যে 'টুনটুনির বই', 'মহাভারতের গল্প', 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'সেকালের কথা', 'গুপি গাইন ও বাঘা বাইন' ইত্যাদি তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার সাক্ষ্য দেয়।

এই গল্পটি 'মহাভারতের গল্প' থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কাহিনীর সঙ্গে বাইবেলের 'নোয়া'-র কাহিনীর খুব সাদৃশ্য আছে। বন্যায় সৃষ্টি ধ্বংস হওয়া এবং পরে সামান্য কয়েকজন সাধু ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন সৃষ্টি বা যুগ পত্তন হওয়ার কথা সম্ভবতঃ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একই ভাবে প্রচলিত ছিল।]

সত্যযুগে এক মুনি ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মনু। তাঁহার পিতার নাম ছিল বিবস্বান, তাই লোকে তাঁহাকে বলিত বৈবস্বত মনু। বিবস্বানের সময় পৃথিবীতে কত সুন্দর মানুষ ছিল। কিন্তু বৈবস্বত মুনির মত সুন্দর কেহই ছিলেন না। কত বড় বড় মুনি ছিলেন, কিন্তু বৈবস্বত মুনির চেয়ে বড় মুনি কেহই ছিলেন না।

একদিন চারিনী নদীতে বৈবস্বত মুনি স্নান করিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, পরনের কাপড় ভিজাই রহিল। তাহা লইয়াই মুনি তপস্যা করিতে বসিলেন। তাঁহার মত তপস্যা কেহই করিতে পারিত না।

নদীতে একটি ছোট্ট মাছের ছানা ছিল। সে বেচারা এতই ছোট, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতেই পাওয়া যায় না। মহামুনি তপস্যায় বসিয়াছেন, ছোট্ট মাছের ছানাটি তাহার নিকট আসিয়া তাহার ছোট্ট ডানা দু-খানি জোড় করিয়া বলিল, "মুনি ঠাকুর! আমাকে দয়া করুন। দেখুন আমি কতই ছোট—বড় মাছেরা আমাকে খাইয়া ফেলিবে।"

মুনি চাহিয়া দেখিলেন, একটি ছোট মাছের ছানা তাঁহার নিকট হাত জোড় করিতেছে। মুনির দয়া হইল; তিনি বলিলেন—"বাছা, তোর কি চাই? বল্, আমি কি করিলে তোর দুঃখ দূর হইবে।"

ছোট মাছের ছানাটি তাহার ছোট্ট ডানা দু-খানি জোড় করিয়া বলিল, "আমাকে এখান হইতে লইয়া যাউন। আমাকে দিয়া আপনার উপকার হইবে।"

দু-হাতে অঞ্জলি করিয়া, মহামুনি ছোট্ট মাছের ছানাটিকে তুলিয়া লইলেন। তারপর তাহাকে বাড়িতে আনিয়া, ধবধবে সাদা কলসীর ভিতরে রাখিয়া পরম যত্নে পুষিতে লাগিলেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, মাছের ছানাটি ততই বাড়িতে লাগিল। শেষে আর সেই কলসীতে তাহার জায়গা হয় না। তখন সে মুনিকে বলিল, "মুনি ঠাকুর, এখানে তো আমি নড়িতে চড়িতে পাই না। দয়া করে আমাকে অন্য জায়গায় লইয়া যাউন।"

সেইখানে একটা খুব বড় দীঘি ছিল ; তাহার এপার হইতে ওপার ধোঁয়ার মত দেখা যাইত। মুনি মাছের ছানাটিকে কলসী হইতে তুলিয়া, সেই দীঘিতে নিয়া রাখিলেন।

তাহার পর অনেক বৎসর গেল। অনেক বৎসর ধরিয়া সেই দীঘিতে থাকিয়া, মাছটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল। শেষে আর সেই বিশাল দীঘিতেও তাহার জায়গা হয় না। তখন সে অনেক মিনতি করিয়া মুনিকে আবার বলিল, "মুনি ঠাকুর, আপনার দয়ায় দেখুন আমি কত বড় হইয়াছি। এখন আর এই দীঘিতেও আমার জায়গা হয় না। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, দয়া করিয়া আমাকে আর কোথাও লইয়া যাউন।"

তখন মুনি মাছটিকে ঐ দীঘি হইতে তুলিয়া, গঙ্গায় নিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে, গঙ্গায়ও তাহার জায়গা কুলাইল না। তখন সে মুনিকে বলিল, "মুনি ঠাকুর, এখানেও আমার জায়গা হইতেছে না। আমাকে সমুদ্রে লইয়া চলুন।"

তখনই, এত বড় মাছ, তাহাকে মুনি মাথায় করিয়া লইলেন। তাহার গায়ে এমন গন্ধ ছিল, সে গন্ধ মুনি সহিয়া রহিলেন ; শ্যাওলা আর পোকার কথা তিনি মনেই করিলেন না। এইরূপে তাহাকে বহিয়া নিয়া, মুনি সাগরের জলে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন সেই মাছ হাসিতে হাসিতে বলিল, "মুনি ঠাকুর, আপনি আমাকে এত করিয়া বাঁচাইলেন, আমিও আপনার উপকার করিতে ভুলিব না। এখন, এক যে ভয়ানক বিপদের সময় আসিতেছে, তাহার কথা শুনুন। সৃষ্টি নষ্ট হইতে আর দেরি নাই। এই বেলা আমি যাহা বলিতেছি তাহা করুন। একটা খুব বড় নৌকা প্রস্তুত করাইয়া, তাহাতে খুব মোটা, খুব শক্ত দড়ি বাঁধিয়া রাখিবেন।

সেই নৌকায় সকল রকম বীজ সঙ্গে লইয়া, সপ্তর্ষিদিগের সহিত আপনি উঠিয়া বসিয়া থাকিবেন। তারপর যখন সময় হইবে, তখন

আমি আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইব। তখন আমার মাথায় একটা শিং থাকিবে।"

এই বলিয়া মাছ চলিয়া গেল। মুনি নৌকা প্রস্তুত করাইয়া, তাহাতে উঠিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে সেই মাছও শাল-গাছের মত উঁচু শিং মাথায় করিয়া, সেইখানে আসিয়া দেখা দিল। সেই শিং-এ সেই মোটা দড়ি দিয়া নৌকাখানিকে বাঁধিয়া দিলে আর কোনো ভয় রহিল না।

তাহার পর মেঘ ডাকিতে লাগিল ; ঢেউ সকল পর্বতের মত উঁচু হইয়া ছুটিতে লাগিল ; অকূল সমুদ্রের ভিতরে ভয়ঙ্কর ঝড়ে পড়িয়া, নৌকাখানি ঘুরপাক খাইতে লাগিল। সেই বিষম ঝড়ে সংসারের সকল প্রাণী ডুবিয়া মরিল ; কেবল মনু আর সেই সাতজন ঋষি, সেই মাছের দয়াতে প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন।

শেষে জল কমিতে লাগিল। ক্রমে হিমালয়ের চূড়া দেখা দিল। তখন সেই মাছ বলিল, "মুনি ঠাকুর, এই পর্বতের চূড়ায় নৌকা বাঁধুন।"

মাছের কথায় মুনি সেইখানে নৌকা বাঁধিলেন। সেই মাছ ছিলেন ব্রহ্মা। তিনি এইরূপ করিয়া প্রলয়ের সময়ে সেই আটটি মুনিকে বাঁচাইয়াছিলেন।

[—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী]

অনুশীলনী

১। কাহিনীটি নিজের ভাষায় লেখ।
২। মাছটি বৈবস্বত মুনিকে কি আশ্বাস দিয়ে চলে গিয়েছিল ? কিভাবে সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল ?
৩। মাছের আকৃতির ক্রমপরিণতির বিবরণ দাও। মাছের সঙ্গে মুনির প্রথম ও শেষ সাক্ষাতের ঘটনা-সূত্র বল।
৪। বৈবস্বত মুনি এবং মাছের পরিচয় দাও।
৫। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—বিশাল ; উপকার।
৬। শব্দার্থ দাও :—অঞ্জলি ; অকূল; মিনতি ; ভয়ঙ্কর ; বিষম।
৭। টীকা লেখ :—সপ্তর্ষি ; ব্রহ্মা ; বৈবস্বত মুনি ; সত্যযুগ ; মনু।

৮। পদ-পরিবর্তন কর :—উপকার ; পর্বত ; সমুদ্র; জল ; গঙ্গা ; সুন্দর।

৯। বাক্য-গঠন কর :—প্রলয় ; ঘুরপাক ; প্রস্তুত ; সৃষ্টি ; বিশাল।

১০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—'একটি খুব—নৌকা— —, তাহাতে খুব—, খুব— — —রাখিবেন। সেই নৌকায়—রকম— —লইয়া, —সহিত, আপনি— —রাখিবেন।"

A mythological — story



[শিবনাথ শাস্ত্রীর (জন্ম ১৮৪৭, মৃত্যু ১৯১৯) জন্মস্থান মাতুলালয় চাংড়িপোতা, ২৪ পরগণা ; পিতৃভবন মজিলপুর, ২৪ পরগণা। উভয় কুলই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশ। সংস্কৃত কলেজ থেকে এম্. এ. পাস করে শাস্ত্রী উপাধি পান। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ও পরে আচার্যপদ লাভ করেন। অল্প বয়স থেকে সাহিত্য-চর্চা করেন। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখতেন, তার প্রধান বিষয়-বস্তু ছিল দেশের ধর্ম, সমাজ ও নৈতিক জীবনের সংস্কারসাধন। তাঁর দুটি অসামান্য রচনা 'আত্মচরিত' ও 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ'। তাঁর রচিত কবিতার বই : 'পুষ্পমালা', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'হিমাদ্রি কুসুম', 'নির্বাসিতের বিলাপ' ইত্যাদি। কয়েকখানি উপন্যাস ও প্রবন্ধের বইও রচনা করেছিলেন।

এই প্রবন্ধটি তাঁর 'প্রবন্ধাবলি' থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। রামমোহন রায়কে কেন আধুনিক ভারতের জনক বলা হয়,

তার উত্তর এখানে পাওয়া যায়। ভারতীয় চিন্তার তিনি যে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, তার ফলেই ভারতীয়রা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছিল আর পরবর্তী কালে স্বাধীনতার পথ খুঁজে পেয়েছিল।]

মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। মনে করিতেন, এই মানবাত্মা সেই বিশ্বাত্মার-ই অঙ্গীভূত। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্বকে তিনি এইজন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই কারণে পৃথিবীর যে কোনও বিভাগে লোকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিত তাহারই সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ হইত এবং স্বাধীনতালাভ-প্রয়াসে কোন জাতি অকৃতকার্য হইতেছে জানিলে তিনি মর্মাহত হইতেন। ইটালীয়গণ অনেক চেষ্টার পর যখন অস্ট্রিয়াবাসিগণের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই সংবাদে রামমোহন রায় কলিকাতাতে শয্যাস্থ হইলেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। অপর দিকে স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি আনন্দে কলিকাতার টাউন-হলে ভোজ দিলেন।

তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারী ডিগ্‌বী সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট কর্ম করিবার সময় ডিগ্‌বী অনেক দেখিয়াছেন যে, রামমোহন রায় ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। যদি দেখিতেন যে স্বাধীনতা পক্ষের পরাজয় হইতেছে, তাহা হইলে দরদর ধারে তাঁহার দুই কপোলে অশ্রুধারা বহিত।

কুমারী কলেট্ বলিয়াছেন যে ইংলণ্ড গমনকালে গুড্ হোপ অন্তরীপে জাহাজে পড়িয়া গিয়া রামমোহন রায়ের পা ভাঙিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে, তখন ভগ্নপদ লইয়া সেই জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার জাহাজের

কাপ্তেন অনেক নিষেধ করিলেন, সে নিষেধ তিনি কোনমতেই শুনিলেন না। ভগ্নপদে অতিকষ্টে ফরাসী জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। আসিবার সময় ফ্রান্সের জয়ধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন।

তাঁহার ইংলণ্ড বাসকালে, ১৮৩১ সালে, পার্লামেণ্ট মহাসভাতে সুপ্রসিদ্ধ রিফর্ম বিলের বিচার উপস্থিত হয়। ঐ আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার প্রস্তাব হয়। রামমোহন রায় সেই প্রস্তাবে আপনাকে এতদূর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে প্রকাশ্য-ভাবে বলিয়াছিলেন যে ঐ আইন বিধিবদ্ধ না হইলে, তিনি ইংলণ্ডের অধিকারে আর থাকিবেন না। তাঁহার পৈতৃক ও স্বোপার্জিত সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি আমেরিকাতে গিয়া বাস করিবেন। কি স্বাধীনতাপ্রিয়তা! কি মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান!

এই মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান আর এক দিকে অসাধারণ আত্মমর্যাদা-জ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম এক দিনের একটি ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। ঘটনাটি এই—"এক দিন রামমোহন রায় জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় অপরাহ্নে হঠাৎ অ্যাডামের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অ্যাডাম দেখিলেন তাঁহার মুখে ভয়ানক উত্তেজনার চিহ্ন। দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। রামমোহন রায় বলিলেন, "তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমার গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলি।"

পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "জল! জল!" ত্বরায় জল দেওয়া হইল। জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, "আমার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও সর্বপ্রধান দুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ মিড্‌ল্‌টন আজ আমাকে এই বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছেন যে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে আমার পদ আরও বড় হইবে। ছি! ছি! আমাকে এত ছোটলোক মনে করে!"

অ্যাডাম বলিয়াছেন, "ইহার পর রামমোহন রায় আর বিশপ মিড্ল্টনের মুখদর্শন করেন নাই। বৈষয়িক সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্মে প্রবৃত্ত করা, ইহা তাঁর চক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ, অসহনীয় অপমান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।"

কেবল ইহাও নহে, মানবাত্মার মহত্বজ্ঞান হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়া তাঁহার স্বাবলম্বনশক্তি অপরিসীম ছিল। নিজের গূঢ় আত্মশক্তিতে এতদূর বিশ্বাস ছিল যে কিছুতেই তাঁহাকে কেহ দমাইতে পারিত না, কোন বিঘ্ন বা বাধা তাঁহাকে স্বকার্য-সাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন বজ্রমুষ্টিতে তাহা ধরিতেন এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না।

ইংরাজী বুল্-ডগ নামক কুকুরের এইরূপ খ্যাতি আছে যে, সে একবার যে প্রাণীকে কামড়াইয়া ধরে, তাহার দেহকে মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও, সে কামড় ছাড়ে না। রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্টি বুল্-ডগের কামড়ের ন্যায় ছিল, তাঁহার অভীষ্ট কার্য হইতে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। বরং সে পথে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হইত ততই তাঁহার বীরহৃদয় আনন্দিত হইত।

বিঘ্ন দেখিয়া হটিয়া যাওয়া, ভয়প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতা-বশতঃ সঙ্কল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, তিনি কাপুরুষতা ও নিজ শক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করিতেন। ব্যাপটিস্ট মিশনের মিশনারিগণ যখন তাঁর প্রণীত 'Third appeal to the Christian Public' তাঁহাদের ছাপাখানায় মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন তিনি নিজে মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া লোকদিগকে কম্পোজিটরের কাজ শিখাইয়া, নিজের গ্রন্থ তাহাতে মুদ্রিত করিয়া তবে ছাড়িলেন।

স্কচ্ মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডফ্ যখন তাঁহার আহ্বানে

কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন এবং প্রথম মিশনারী স্কুল স্থাপনের পথে প্রবল বিঘ্ন দেখিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, যখন শহরের ভদ্রলোকেরা এমনি বিরোধী হইলেন যে স্কুলের জন্য দেশীয় বিভাগে একটি বাড়ী ভাড়া করা ও পড়িবার জন্য বালক সংগ্রহ করা ডফের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, তখন রামমোহন রায়কে এই বিঘ্ন বাধার কথা জানাইলেন, তিনি ডফের স্কুল বসাইবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাশ্রিত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ি ডফের জন্য স্থির করিয়া দিলেন এবং আপনাদের বন্ধুবান্ধবের পরিবার হইতে প্রথম ছয়টি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন। ইহা করিয়াও নিরস্ত হইলেন না ;- স্কুল খুলিবার দিনে নিজে উপস্থিত হইয়া বালক-দিগকে উৎসাহিত করিলেন এবং তৎপরে সর্বদা গিয়া স্কুলের কার্য পরিদর্শন দ্বারা ও পরামর্শদানাদি দ্বারা ডফ্‌কে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

তিনি বিলাত গমনার্থ উদ্যত হইলে তাঁহার প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার ও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় অভীষ্ট-সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া নিজের সহিত যাইবার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করিলেন। যে সময়ে সমুদ্রে পা বাড়ালেই জাতিচ্যুত হইবার ভয় ছিল, সে সময়ে বিলাত গমনের জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করা কিরূপ কঠিন কাজ ছিল, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। যিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে পিতা-কর্তৃক গৃহতাড়িত হইয়াও স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইহার কিছুই বিচিত্র ছিল না।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসে না। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড় হইয়া দাঁড়াইবে কি ছোট হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্ন-বাধা,

পাপ-প্রলোভন, জীবনের সমস্যা সকলেরই পথে উপস্থিত হয়। তাহার উপরে উঠা, নিচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপরে বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি বড়; আর তুমি আমি নিচে পড়িয়া যাই, এইজন্য আমরা ছোট। তিনি যে উপরে উঠিয়াছিলেন, তাহারও ভিতরকার কথা নিজের শক্তি-সামর্থ্যে ও মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস।

[—শিবনাথ শাস্ত্রী]

অনুশীলনী

১। রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রেমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

২। রামমোহনের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখ কর।

৩। "মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান" বলতে কি বোঝায়? রামমোহনের জীবনে এই জ্ঞান কি রূপ নিয়েছিল?

৪। "তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমার গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলি।"—কে কাকে বলেছিলেন এবং কি প্রসঙ্গে? ঘটনাটি থেকে রামমোহনের চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়?

৫। পদ-পরিবর্তন কর :—রাজনৈতিক ; অন্তর ; উড্ডীন ; ভগ্ন ; আকার ; বৈষয়িক।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—উর্ধ্বতন ; বিস্তৃত ; প্রকাশ্য ; প্রবৃত্ত ; প্রতিকূল।

৭। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—অত্যাচার ; মর্মাহত ; স্বোপার্জিত ; পূর্বাশ্রিত।

৮। শব্দার্থ লেখ :—প্রয়াস ; মর্মাহত ; ব্যগ্রতা ; কপোল ; উড্ডীন ; উন্মোচন ; সংকল্পিত ; অভীষ্ট ; বৈষয়িক ; প্রলোভন ; প্রবৃত্ত ; নিরুদ্যম ; নিরস্ত ; অন্তর্নিহিত।

৯। টীকা লেখ :—নিয়মতন্ত্র-প্রণালী ; গুড্ হোপ অন্তরীপ ; রিফর্ম বিল।

১০। ব্যখ্যা কর :— (ক) "কি স্বাধীনতাপ্রিয়তা……মহত্বজ্ঞান!"
(খ) "তুমি বড় হইয়া…… তোমারই হাতে!"

১১। প্রতিটি বাক্যে ব্যবহৃত যুগল শব্দের মধ্যে যথোপযুক্ত শব্দটি রাখিয়া অপরটি বর্জন কর :—

(ক) সাময়িক ব্যর্থতায় $\frac{\text{নিরুদ্যম}}{\text{নিরস্ত}}$ হইয়া তিনি কার্যে $\frac{\text{নিরুদ্যম}}{\text{নিরস্ত}}$ হইলেন।

(খ) তুমি যে অন্যায় করিয়াছ তাহা $\frac{\text{অসহনীয়}}{\text{অমার্জনীয়}}$ অপরাধ।

(গ) তিনি যে সকল কটু বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা আমার পক্ষে $\frac{\text{অসহনীয়}}{\text{অমার্জনীয়}}$ ।

Some salient features of the Character of Rammohan



জরিপের জয়

[জন্ম ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। ছোটদের ও বড়দের জন্য এই লেখিকার অনেকগুলি উপন্যাস ও গল্পের বই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ইনি বাস্তব বিষয়ে সরস রচনার পক্ষপাতী। এঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভারতীয় জরিপ-বিভাগে তাঁর কর্মজীবন কেটেছিল। সেই সূত্রে জরিপের নানান্ তথ্য লেখিকার কর্ণগোচর হয়েছিল। পরে তিনি এ বিষয়ে আরো পড়াশুনা করেছিলেন। নিচের কাহিনীটি সত্য-ঘটনা অবলম্বনে লেখা।]

জরিপের গুরুত্বের কথা অনেকেই হয়তো জানে না। জরিপ মানে মাপা, জমি মাপা। কিন্তু ভারতীয় জরিপ-বিভাগের কাজ তার চাইতে

অনেক বেশী ব্যাপক। এ কাজ শুরু হয়েছিল প্রায় এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, এ দেশটাকে জানবার কোন আগ্রহ থেকে নয়, বরং ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজাগিরি চালাবার সুবিধার জন্য। কাজের বেলায় কিন্তু স্বার্থশূন্য আগ্রহী লোকের অভাব দেখা গেল না।

এত বড় একটা দেশ, এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে খবর, বা কর্মী, বা সৈন্য ও তাদের রসদ পাঠানো বড় সহজ ছিল না। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব, মাঝপথে কোন কোন পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, নালা-নদী, ঘন বন কিংবা দুর্বৃত্ত শত্রু দেখা যাবে, এসব অতি প্রয়োজনীয় তথ্য কারো জানা ছিল না।

তার উপর ভালো রাস্তাও বেশি ছিল না, নদীর উপর সেতু ছিল না, সবই তৈরি করে নিতে হয়েছিল। তার জন্য স্থপতি বা এঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। এমন কি প্রথম দিকে সামরিক এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে থেকেই জরিপ-বিভাগের কর্মী বাছাই করা হত। এদের হওয়া চাই স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, উৎসাহী ও অসমসাহসিক।

এ দেশের লোকের সহযোগিতা ছাড়া জরিপের কাজ চলত না। এরাই গাঁয়ে গাঁয়ে, বনে-বাদাড়ে, পাহাড়ের কন্দরে, জঙ্গলে, নদী-নালায় ঘুরে ঘুরে নির্ভুল সব তথ্য এনে দিত। জরিপের কাজে ক্রমে এরা দক্ষ হয়ে উঠেছিল। নির্ভুলভাবে পাহাড়ের উচ্চতা, নদীর দৈর্ঘ্য ও গভীরতা, স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যা, অবস্থা, মনোভাব এরা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ করে দিত, কোন বিদেশী কর্মীর পক্ষে তেমন সম্ভব হত না।

কোন কোন অঞ্চলে সাহেবদের প্রবেশ করাই সম্ভব ছিল না; সেখানকার লোকেরা তাদের দেখতে পেলেই মেরে ফেলত। এমনকি ভারতীয় কর্মীদেরও প্রাণ হাতে করে যেতে হত, কারণ সাহেবদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা আছে, এ কথা জানাজানি হলেও আর রক্ষা ছিল না। তারা ব্যবসায়ী, কিম্বা তীর্থযাত্রী সেজে, জরিপের যন্ত্রপাতি লুকিয়ে নিয়ে যেত।

একই পাহাড় নদীর মাপ বারে-বারে জনে জনে হিসাব করে নিত, পাছে কোনো ভুল থেকে যায়। শোনা যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে দেখা গেছে যে ওদের মাপ-জোকে সামান্যই ভুল থাকত। অথচ ইংরেজ বড় সাহেবদের নাম যদি বা রক্ষিত হয়ে থাকে, আসল কাজ করত যে সব দিশী মানুষরা, তাদের নামও কেউ করে না। শুধু জরিপ-বিভাগের খাতা-পত্রে কিছু নাম পাওয়া যায়, তাও আবার নামের বদলে হয়তো দুই সংখ্যা মাত্র লেখা আছে। যেমন মাউণ্ট এভারেস্টের কথা ধরা যাক ; কর্ণেল এভারেস্টও পাহাড় মাপেন নি বলে জানা গেছে। মেপেছিলেন রাধানাথ শিকদার বলে একজন বাঙ্গালী সার্ভেয়ার, অথচ নাম হল বড়সাহেবের।

মানচিত্র খুলেই দেখছি কোন পাহাড় কত উঁচু, কোন নদী কত গভীর, কত লম্বা, কোথা দিয়ে গেছে ; কোথায় কোন গ্রামের, কোন নগরের অবস্থান ; কোথায় বন, কোথায় মরু ; কোন দিক দিয়ে পথ গেছে ; রেল পড়েছে কোথায়। কোন জায়গায় কিসের ফলন, কিসের চাষ, কেমন মানুষের বাস। এক কথায়, যেসব তথ্য না জানলে বর্তমান জীবন-যাত্রা অচল হয়ে পড়ত, তার অনেকখানিই এদের আহরণ করা। ভারতের সব মানচিত্র এই জরিপ-বিভাগেরই কীর্তি। এক দিনের কাজ নয়, দুশো বছরের অবিরাম সাধনার ফল।

সিপাহী-আন্দোলনের পর থেকে জরিপের কাজে একটা বলিষ্ঠ কার্যকরী ভাব দেখা গিয়েছিল। সে সময়ে কুমায়োনের পার্বত্য অঞ্চলে মেজর স্মিথ্ বলে একজন উৎসাহী ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলি ছোট ছোট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব স্কুলে ইংরিজি শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। ইংরিজি-জানা স্থানীয় শিক্ষক রাখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নয়ন সিংহ। বয়স কম, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, উৎসাহী ও সাহসী। জরিপের কাজের জন্য ঠিক যেমনটি দরকার। তখনই তাঁকে নিয়ে নেওয়া হল। দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা অর্জনের

এমন অপ্রত্যাশিত সুযোগ তিনিও কি সহজে ছাড়েন। তার উপর ওদিককার ভাষা তাঁর কণ্ঠস্থ, চেহারায় মঙ্গোলীয় ভাব; তিব্বতের অধিবাসী বলেও নিজেকে তিনি স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দিতে পারতেন।

সে সময়ে হিমালয়ের উত্তরের ভূ-খণ্ডের কোনো মানচিত্র ছিল না; সেখানকার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানাও ছিল না। ওদিকে বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। তবে কি হিন্দুকুশ অঞ্চল, নেপাল-ভুটানের পার্বত্য প্রদেশ, লাসা, ইয়ার্কন্দ, কাশগড় ইত্যাদি সমস্তই অজানা থেকে যাবে? এসব তথ্য জানতে হলে ছদ্মবেশধারী ভারতীয়, বা নেপালী কি ভোটকর্মী ছাড়া উপায় কি?

এই শিক্ষিত দেশী পর্যটকদের জরিপ-বিভাগে বলা হত পণ্ডিত পর্যটক। নয়ন সিং ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম।

দেরাতুনে জরিপ-বিভাগের হেড আপিস ছিল, সেখানে তুই বছর ধরে নয়ন সিং আর তাঁর আত্মীয় মণি সিংকে তৈরী করা হল। সে কি যেমন-তেমন শিক্ষা! জরিপের যন্ত্রপাতির ব্যবহার; গ্রহ-তারা চেনা, তাদের সাহায্যে দিক্-নির্ণয় করা; থার্মোমিটারের সাহায্যে পাহাড়ের উচ্চতা মাপা, অঙ্ক কষা, রেকর্ড রাখা; নিজের পদক্ষেপের মাপ দিয়ে পথের দৈর্ঘ্য হিসাব করা; যে সব জায়গা দিয়ে যেতে হবে, সেখানকার ভাষা, নিয়ম-কানুন, পোষাক ইত্যাদি আয়ত্ত করা; সব দিয়ে এক অভিনব পদ্ধতি। তার উপর, সাধুর ছদ্মবেশই নেওয়া হোক, কি ব্যবসায়ীই সাজা যাক, তখনকার মতো কায়মনোবাক্যে তাই হয়ে যেতে হবে।

দেরাতুনে বড় সাহেব ওদের ডেকে বললেন যে, সব চাইতে ফল-প্রদ কাজ হয় ওঁরা যদি নেপালের ভিতর দিয়ে সোজা তিব্বতের প্রধান নগর লাসায় চলে যান। যাওয়া মানে বেড়াতে যাওয়া নয়; কত দূর, কত উঁচু, কি রকম আবহাওয়া, অধিবাসীদের হাল-চাল, গ্রাম, নদী, বন সব বিষয়ে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করে আনা। তার উপর লুকিয়ে

যাওয়া। ওঁরা জরিপ-বিভাগের লোক জানলে, নেপালেও কোনও সাহায্য বা সহযোগিতা পাওয়া যাবে না।

স্থির হল নেপালে বলা হবে যে চীন সীমান্তের কয়েকজন কুমায়োনবাসীর টাকা চুরি করে চোররা লাসায় পালিয়েছে, ওরা সেই টাকা উদ্ধার করতে যাচ্ছেন। এ কথা শুনলে নেপালীদের সহানুভূতি হবে। আবার তিব্বতে পৌঁছে বলা হবে ওরা তিব্বতী লামা, তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়েছেন। এই ভাবে প্রস্তুত হয়ে, ১৮৬৫ সালে, ওঁরা দুই জন প্রাণ হাতে করে বেরিয়ে পড়লেন। ঘটনাচক্রে যাত্রার শুরুতেই দুজনার ছাড়াছাড়ি হল। মণি সিং অনেক চেষ্টা করেও মধ্য-তিব্বতে প্রবেশ করতে পারলেন না। তাই বলে তিনি বৃথা সময় ও শ্রম নষ্ট না করে, পশ্চিম তিব্বতের গার্টক অঞ্চলের পথ-ঘাট মেপে, অনেক মূল্যবান তথ্য নিয়ে ফিরে এলেন।

এদিকে নয়ন সিং নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তে 'গিয়া-লা' বলে একটা উঁচু গিরিপথের মুখে পৌঁছে দেখেন একদল ব্যবসায়ী ঘোড়া আর খচ্চরের পিঠে নানারকম বাণিজ্যের জিনিস বোঝাই করে, তিব্বতে যাবার জন্য তৈরি। নয়ন সিং তাদের দলে ভিড়ে গেলেন। সঙ্গে ছিল যৎসামান্য টাকা-কড়ি ; খাওয়া, যাওয়া আর নিরাপত্তা বাবদ ব্যবসায়ীরা তার অর্ধেকের বেশি নিল। ওদিকে গ্রামের মোড়ল তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিল তিনি লাসা যাবেন না। লাসায় গেলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে।

চলেন আর পদক্ষেপ গোনেন, পরে গোপনে সব লিখে রাখেন। দুঃখের বিষয়, ঐ ব্যবসায়ীয়া ছিল মন্দ লোক। সীমান্ত পেরিয়ে তারা নয়ন সিং-এর সব টাকা-কড়ি নিয়ে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ল। সৌভাগ্যের কথা যে নয়ন সিং-এর ছোট হাত-বাক্সটি ওরা নিতে পারেনি। তার তলায় ছিল একটা গোপন খোপ। সেই খোপে লুকানো ছিল জরিপের জিনিসপত্র।

সাজ-পোষাক তিব্বতী লামার মতো ; হাতে প্রার্থনা-চক্র, জপের

মালা আর কাঠের ভিক্ষা-পাত্র। তার বেশি আর কি চাই? নয়ন সিং অনেক দূরের পথ একলাই এগুলেন; তারপর এক দল লাডাকী বণিকের সঙ্গ পেলেন। তারা মানস-সরোবর হয়ে, লাসা যাচ্ছিল। সোজা লাসা যাওয়া বারণ ছিল। তাদের সঙ্গে কিছু দূর গিয়ে, অসুখের ভান করে নয়ন সিং পেছিয়ে পড়লেন।

অত দূর ঘুরে গেলে তাঁর চলবে না। বৃক্ষহীন তুষার-প্রান্তরের উপর দিয়ে লাসা অভিমুখে তিনি একাই চললেন। সেখানকার উচ্চতা ১৫০০০ ফুট, সারা দিন হাড়-কাঁপানো বাতাস বয়।

মাঝে মাঝে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়। পুণ্য-লাভের আশায় তারা লামাকে খাবার জিনিস দেয়; তাতেই তাঁর কোন রকমে চলে! চলেন আর পদক্ষেপ গোনেন আর মালা জপেন। মালাটা একটু অদ্ভুত ধরনের; বৌদ্ধ জপের মালার ১৩৮টি লাল পুঁতির বদলে তাঁর মালায় মাত্র ১০০টি পুঁতি। নয়টা পুঁতি একটু ছোট, দশমটা অপেক্ষাকৃত বড়। একশো পা ফেলা হলে, একটি করে পুঁতি সরাতেন; অর্থাৎ এক হাজার পা ফেললে একটি করে বড় পুঁতিতে পৌঁছতেন। সমস্ত মালাটি ঘুরে এলে দশ হাজার পা ফেলা হত।

দেরাদুনে ওঁরা এমন অভ্যাস করেছিলেন যাতে দুই হাজার পদক্ষেপে এক মাইল পথ চলতে পারেন। তার মানে পাঁচ মাইল চললে একবার মালা ঘুরে আসত। চলবার সময় প্রার্থনা-চক্র ঘোরাতেন। সবাই ভাবত লামা বুঝি প্রার্থনা করছেন, কেউ তাঁকে বিরক্ত করত না; নির্ভুল গণনা চলত।

বড় সুন্দর ঐ প্রার্থনা-চক্রটি ছিল; কারুকার্য করা কাঠের হাতলের উপর চক্রটি ঘুরত। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি, তাতে ফিরোজা পাথর বসানো। তবে অন্যান্য চক্রের চাইতে এটা একটু আলাদা রকমের ছিল। এর ভিতরে পাকানো ছিল কাগজের টুকরো, তাতে মাপ লেখা হত। চক্রের মাথাটা খোলা যেত। ভিতরে ছিল ছোট একটি দিক্-নির্ণয় যন্ত্র।

১৮৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারি, অত্যুচ্চ 'কারো' গিরি-পথ পেরিয়ে, অনেকগুলো জমে-যাওয়া নদী-নালার ওপর দিয়ে নয়ন সিং লাসা নগরে পৌঁছলেন। এইখানে পাহাড়ের উপরে ধর্ম-রাজ দালাই লামায় প্রাসাদ, 'পোতালা'।

এখানকার কাজ ভালো ভাবে শেষ করতে হলে, তিন মাস সময় লাগবে। সস্তা সরাইখানায় বড় ভিড় ; তার মধ্যে গোপনে তথ্য সংগ্রহ করা ও হিসাব কষার অসুবিধা, কাজেই নিজস্ব একটা আস্তানা চাই।

ও-দিকে পয়সা-কড়িও ফুরিয়ে এসেছিল ; তা ছাড়া অন্য ভাবনা-চিন্তাও ছিল। একদিন তাঁর সামনেই একজন চীনা পর্যটককে বিনা অনুমতিতে লাসায় আসার জন্য প্রাণ-দণ্ড দেওয়া হল। তাই দেখে নয়ন সিং-এর মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়।

তবু তিনি সহজে ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। লাসা নগরকে মানচিত্রে তার যথাস্থানে না বসিয়ে ছাড়েন-ই বা কি করে ?

হিন্দুস্থানের সওদাগরেরা কিভাবে হিসাব রাখে, লাসার কয়েকজন বড় বড় ব্যবসাদারদের তাই শিখিয়ে, নয়ন সিং পয়সা রোজগারের সমস্যা মিটিয়ে ফেললেন। সেই পয়সা দিয়ে দুটি ছোট ঘর ভাড়া নিলেন। সেই আস্তানা থেকে গোপনে গভীর রাত্রে তারার অবস্থান পরীক্ষা করে, সঙ্গে আনা জরিপের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, প্রায় নির্ভুলভাবে লাসার এবং ঐ অঞ্চলের অবস্থান, উচ্চতা, দূরত্ব ইত্যাদি নির্ণয় করলেন। থার্মোমিটারে তাপ-মাত্রা দেখে, জল ফুটতে কতক্ষণ সময় লাগে লক্ষ্য করে, তিনি লাসার উচ্চতাকে বলেছিলেন ১১,৪০০ ফুট। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেখা গেছে ঐ উচ্চতা হল ১১,৮০০ ফুট। কতটুকুই বা তফাৎ।

নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পন্ন হলে, আবার এগারো শো মাইল পেরিয়ে, হিমালয় ডিঙ্গিয়ে, দেশে ফেরার পালা। ভাগ্য ভালো, সেই লাডাকী বণিকরাও তত দিনে মানস-সরোবর হয়ে, লাসায় এসে তাদের কাজ

সেরে, ভারতে ফেরার তোড়জোড় করছিল। নয়ন সিং আবার তাদের সঙ্গ নিলেন। তিব্বতের বিশাল সাং-পো নদী ভারতে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। সেই সাং-পোর তীর ধরে পাঁচশো মাইল যেতে ওঁদের দুই মাস সময় লাগল। তার পর দক্ষিণ-পশ্চিমে নেপালের পর্বতমালা দেখা দিল।

নয়ন সিং এবার বণিকদের দল ছেড়ে, পাহাড় চড়তে শুরু করলেন। গিয়া-লা গিরি-পথ দিয়ে ফেরার উপায় ছিল না, কারণ ও-পারের মোড়লকে কথা দিয়ে এসেছিলেন যে যদি লাসা যান, তা হলে যেন তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। কাজেই ছোট এক নাম-না-জানা গিরি-পথ দিয়ে তাঁকে নেপালে প্রবেশ করতে হল।

দুঃখের বিষয়, প্রথম যে গ্রামে প্রবেশ করলেন, সেখানেই তাঁকে বে-আইনী তিব্বতী পর্যটক বলে গ্রেপ্তার করা হল। ভাগ্যিস্ ঐ গ্রামবাসীরা ওঁর-ই মতো কুমায়োনের ভোট জাতীয় ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

তিনি নিরাপদে কাটমাণ্ডুতে পৌঁছে দেখেন, সেখানে মনি সিং তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। তারপর দুইজনে দেরাদুন যাত্রা করলেন। এই অভিযান শেষ করতে দুই বছর সময় লেগেছিল। এই দুই বছরে নয়ন সিং যে-সব তথ্য আহরণ করেছিলেন, তাকে অমূল্য বলা চলে। লাসার যথার্থ অবস্থান, নেপাল থেকে, হিমালয়ের উপর দিয়ে ১২০০ মাইল পথের বিস্তারিত বর্ণনা, একত্রিশটি জায়গার নির্ভুল অক্ষাংশ নিরূপণ, তেত্রিশটি পর্বত-শিখরের উচ্চতা নির্ণয় আর ৬০০ মাইল ধরে সাং-পো নদীর গতি-পথ নির্ধারণ, এ তো কম কৃতিত্বের কথা নয়।

দেশ-বিদেশে নয়ন সিং-এর খ্যাতি পেঁছেছিল। নানান জায়গা থেকে মানপত্র ও পুরস্কার পেয়েছিলেন। সব চাইতে বড় কথা যে তিনি আজও দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

[—লীলা মজুমদার]

অনুশীলনী

১। জরিপ-বিভাগের কি কাজ বল।

২। কি ধরনের লোক জরিপ-বিভাগে নেওয়া হতো, এবং কেন? তাদের কি ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে হতো?

৩। নয়ন সিং-এর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বল।

৪। নয়ন সিং কি ভাবে জরিপের যন্ত্রপাতি লুকিয়ে রাখত এবং ব্যবহার করত?

৫। কি উদ্দেশ্যে নয়ন সিং দল থেকে সরে পড়েছিল, এবং কি উপলক্ষ করে?

৬। পদ পরিবর্তন কর :—আগ্রহী; সাময়িক; বৈজ্ঞানিক; কৃতিত্ব।

৭। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—শত্রু; অবিরাম; সৌভাগ্য; বিশাল।

৮। শব্দার্থ দাও :—ব্যাপক; দুর্বৃত্ত; কন্দর; দক্ষ; পুঙ্খানুপুঙ্খ; চিত্তাকর্ষক; নিরক্ষর; অপ্রত্যাশিত; পর্যটক; নিরূপণ।

৯। টীকা লেখ :—জরিপ; স্থপতি; সার্ভেয়ার; রাধানাথ শিকদার; সিপাহী-আন্দোলন; কুমায়োন; মঙ্গোলিয়; হিন্দুকুশ; সাং-পো; ভোট; লাডাকী; মানস-সরোবর; অক্ষাংশ; পোতালা প্রাসাদ।

১০। ব্যাখ্যা কর :—"অথচ তাদের কাজের ফল……উপভোগ করছি।"

Survey & the experience of an well-known surveyor.



[বাংলা-সাহিত্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা লেখক। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-সাহিত্য, কবিতা প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর

পারদর্শিতা অনস্বীকার্য্য। তাছাড়া বিদেশী অনুবাদ সাহিত্যে তিনি সকলের পুরোধা ছিলেন এবং চিত্র-নাট্য রচনাতেও তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি কল্লোল-গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ ও নজরুলের সমকালীন সাহিত্যিক এবং বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। কিশোরদের উপযোগী গল্প রচনাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন।]

কলিকাতা পটলডাঙ্গা স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর চিত্তরঞ্জন দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভুবন-মোহন দাস এবং মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী। তাঁহাদের আসল বাড়ী হইতেছে, ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রামে। ভুবনমোহন আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সেই সময়কার সংবাদপত্রসেবীদের মধ্যেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি কবিতাও লিখিতেন। এই তিন গুণই পরে তাঁহার পুত্রে সমধিক মাত্রায় বর্তে।

ছাত্রাবস্থায় চিত্তরঞ্জন যে খুব মেধাবী ছিলেন, তাহা নয়, কলেজের পড়া অপেক্ষা অন্যান্য কাজে তখন হইতেই তাঁহার উৎসাহ প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত। তিনি "আণ্ডারগ্রাজুয়েট্‌স্ এসোসিয়েশন্" নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করেন...সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল এণ্ট্রান্স ফারষ্ট-আরটস্ পরীক্ষায় বাঙ্গলা ভাষাকে স্থান দেওয়া। সেদিন কিন্তু তাঁহার এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

১৮৯০ সালে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাহার কয়েক মাস পরেই তাঁহার পিতার ইচ্ছানুযায়ী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া চিত্তরঞ্জন সেখানকার প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের নানাপ্রকারের আন্দোলনে যোগদান করিলেন। তখন দাদাভাই নাওরোজী পার্লামেণ্টের সভ্যপদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যুবক চিত্তরঞ্জন দাদাভাই নাওরোজীর স্বপক্ষে নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। তোমরা বোধহয় জান যে, দাদাভাই নাওরোজী প্রথম ভারতবাসী; যিনি বৃটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য হইয়াছিলেন।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে…যাহার ফলে তাঁহার জীবনের গতি বাদলাইয়া যায়। জেমস্ ম্যাক্লিন্ নামে একজন ইংরাজ রাজপুরুষ সেই সময় প্রচার করেন—"India was conquered by the sword and would be retained by it."—"তরবারির সাহায্যে ভারজবর্ষ জয় করা হইয়াছে এবং তরবারির সাহায্যেই তাহাকে শাসনে রাখা হইবে।"

সু:রন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য সেই কথা শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং ওল্‌ডহ্যামের এক সভায় সেই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিরা এক বক্তৃতা দিলেন। অনেকে বল্লেন যে সেই বক্তৃতার ফলেই নাকি তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য মনোনীত হ'ন নাই। সিভিল সার্ভিসে বিফল-মনোরথ হইয়া চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৯৩ সালে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করিলেন। ব্যারিষ্টাররূপে প্রথমে বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে অলসভাবে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় বাঙ্গালীর অন্তরে এক মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছিল। বাঙ্গালী তখন সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, ধর্মে, রাজনীতিতে এক নব-প্রেরণায় জাগিয়া উঠিতেছিল।

এতদিন সে যেন ঘুমাইয়াছিল…সহসা একদিন সে জাগিয়া উঠিয়া দেখে যে, তাহার ঘর নাই, ধর্ম নাই, সাহিত্য নাই, ইতিহাস নাই, শিল্প নাই অথচ তাহার তো সবই ছিল!

তখন তাই দেশময় এক বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল…ফিরাইয়া আনিবার, জাগাইয়া তুলিবার, নূতন করিয়া গড়িবার, যাহা হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য।

এই যে নবজাগরণ…জীবন-সমুদ্রের তীরে এই যে নব-সূর্য্যকে

অভিনন্দন···তাহার আদর্শ ও বাণী জোগাইলেন···শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। এই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া সেই সময় বাঙ্গলার বহু তরুণ স্ব স্ব ভাবে এই নব জাগরণের স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিবার সাধনায় যোগদান করেন এবং চিত্তরঞ্জনও সেই নব-জাগরণের যাত্রা-সমারোহে যোগদান করেন···তবে প্রচ্ছন্নভাবে।

কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া এইআন্দোলনের সঙ্গে দৈব তাঁহার ভাগ্যকে চিরকালের জন্য যোগ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন···এবং সেইখান হইতেই তাঁহার জীবনের সপ্তাশ্বরথ উল্কাবেগে বাহির হইল।

১৯০৮ সালে ২রা মে পুলিশ মাণিকতলা এলাকায় ৩২ নং মুরারী-পুকুর রোডে একটা বোমার কারখানা আবিষ্কার করে এবং সেই সঙ্গে একটা সশস্ত্র বিপ্লবের ষড়যন্ত্রের খবর দেশবাসী জানিতে পারে।

এই ষড়যন্ত্রের সাক্ষাৎ নেতা হিসাবে সেইদিনই শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে লইয়া ছত্রিশ জন যুবক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে গ্রেফতার হ'ন এবং এই সম্পর্কে ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীঅরবিন্দও গ্রেফতার হ'ন।

এই ব্যাপারে সমগ্র দেশের মধ্যে একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গেল। আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বীচক্রফটের এজলাসে এই বিখ্যাত মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ আর্ডলে নর্টন সরকার পক্ষে দাঁড়ান এবং চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দ এবং অন্যান্য আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

এই বিখ্যাত মামলা এবং তাহার ফলাফল তোমরা নিশ্চয়ই সকলে জান। এখানে তাহার বিবৃতির কোনও প্রয়োজন নাই। তবে এই মামলায় চিত্তরঞ্জনের অসামান্য আইনজ্ঞান, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা দেখিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার-রূপে পরিগণিত হইলেন। জোয়ারের স্রোতের মত তাঁহার অর্থাগম

হইতে লাগিল এবং রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাজকীয় বিলাস-বৈভবে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

সেই সময় সর্ব্ব-প্রথমে তিনি তাঁহার পিতার ঋণ সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিয়া দেউলিয়া নাম হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। যখন তাঁহার পিতা আইনতঃ দেউলিয়া হইয়াছিলেন, তখন এ-টাকা না দিলেও তিনি পারিতেন।

একাগ্রচিত্তে তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন বটে, টাকাকে তিনি জীবনে কোনও মর্যাদা দেন নাই···তাই জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত যখনই যে কেহ চাহিয়াছে, তাহাকেই তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে না চাহিতেও নিজে গিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

বাঙ্গলার কত স্কুল, কত কলেজ, কত পরিবার, কত সাহিত্যিক, কত রাজনীতিক, কত ব্যবসায়ী, কত ছাত্র, কত নিঃস্ব-সহায়-সম্বলহীন তাঁহার অকুণ্ঠ-দানের মহিমায় জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করিবার শক্তি পাইয়াছে।

তাঁহার দান যেমন ছিল বিশাল, তিনিও তেমনি ছিলেন সহজ-প্রাপ্য। জীবনের শেষদিনে যখন দারিদ্র আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতেছিল, তখনও তিনি সকল ভুলিয়া তেমনি দান করিতেন। কোন প্রার্থী কখনও তাঁহার নিকট হইতে ব্যর্থ হইয়া আসেন নাই।

যখন মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি পূরাপুরিভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন, তখন তাঁহার মাসিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং তাঁহার হাতে ষোল লক্ষ টাকার ব্রীফ। বহুদিন ধরিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন যে, এরকম দু'পক্ষ বজায় রাখিয়া দেশের কাজ করা যায় না।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল তরঙ্গে ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দুলিয়া উঠিল। জুন মাসে কংগ্রেসের এক কোটী সভ্য, এক কোটি টাকা এবং বিশ লক্ষ চরকা হইল। ১০ই ডিসেম্বর তিনি গ্রেফতার হইলেন। ইহার কিছুদিন

পরে আমেদাবাদের কংগ্রেসে তাঁহার সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। সহকর্মীদের লইয়া আলিপুর জেলে ছয়মাস তাঁহাকে কাটাইতে হইল।

ভারতের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ বিলাসী তাঁহার এতদিনের সযত্নে বর্ধিত সমস্ত জীবনযাত্রাপ্রণালী যখন একদিনে বদলাইয়া একেবারে সর্ব্ব-সাধারণ মানুষের মত সকলের মাঝখানে সহজভাবে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সকলে বলিয়া উঠিল—তুমি দেশবন্ধু! যে-দিন নগ্নপদে কলিকাতার পথ দিয়া দ্বারে দ্বারে তিনি কংগ্রেসের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন, সে-দিনের কথা জীবনে ভুলিব না। ভিখারীর সে কি রাজমহিমা!

যে ব্যক্তির মাসিক সংসার খরচ ছিল ২৭ হাজার টাকা, জেলের রুদ্ধঘরে, দ্বিপ্রহরে কলিকাতার পথে, ট্রেনে থার্ডক্লাস কামরায়, প্রতি-দিনের অবিরাম অবিচ্ছেদ শ্রমের মধ্যে তিনি এমন সহজভাবে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া দেশবাসীও তাঁহাকে একেবারে আপনার জন বলিয়া অন্তরে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

তাহারা যেমন চিত্তরঞ্জনকে এতখানি অন্তর দিয়া ভালবাসিত, চিত্তরঞ্জনও তেমনি সমস্ত অন্তর দিয়া তাহাদের ভাল বাসিতেন। নাগপুর কংগ্রেসে একজন ডেলিগেট সহসা পরলোক গমন করিলে চিত্তরঞ্জন সাত মাইল পথ পদব্রজে সেই শবদেহের অনুগমন করিয়াছিলেন এবং চিতার সম্মুখে দাঁড়াইতে গিয়া চক্ষু দিয়া তাঁহার শোকাশ্রুধারা উবছাইয়া পড়িতেছিল।

১৯২০ সালে কলিকাতার স্পেশাল কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ মন্তব্য পাশ হয়। এই সভায় চিত্তরঞ্জন মহাত্মার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তিনি যে অসহযোগ-নীতি বিশ্বাস করিতেন না, তাহা নয়, তিনি মনে করেন যে, অসহযোগ-নীতি 'প্রবর্তনের সময়' তখনও আসে নাই।

১৯২০ সালে নূতন শাসন-সংস্কারের ফলে প্রথম যে নির্বাচন হয়,

তাহাতে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী তিনি সরিয়া দাঁড়ান। তারপর উক্ত বৎসর নাগপুরে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগমন্ত্রে পুরাপুরি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯২১ সালের প্রারম্ভেই তিনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সারা দেশে অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য তিনি উল্কাবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তিনি যে শুধু অপরের ছেলেমেয়েদের এই সংগ্রামে আহ্বান করিলেন, তাহা নয়, প্রথমেই তিনি আপনার একমাত্র সন্তান চিররঞ্জনকে, নিজের সহধর্ম্মিণী এবং ভগিনীকে এই সংগ্রামে পাঠাইলেন। ১৯২১ সালের ৬ই ডিসেম্বর এবং তাহার পরের দিন যথাক্রমে চিররঞ্জন এবং শ্রীমতী বাসন্তীদেবী গ্রেফতার হইলেন; এবং তার তিনদিন পরে তিনিও গ্রেফতার হইলেন। বিচারে তাঁহার ছয়মাস কারাদণ্ড হইল।

১৯২২ সালের জুলাই মাসে দেশবন্ধু যখন জেলে হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য মির্জ্জাপুর পার্কে যে বিরাট জনসমাগম হয়, তাহাতে সেদিন সকলের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দেশের আপামর জনসাধারণের উপর তাঁহার কি গভীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে।

উক্ত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতিরূপে তিনি কাউন্সিলে গিয়া সেখানকার কার্য্য অচল করিবার কথা তোলেন, কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হয়।

যখন কংগ্রেস তাঁহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল, তখন সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার চরিত্রের এই দিক্‌টার পরিচয় যে-রকমভাবে পাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার শত্রুপক্ষও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। নবগঠিত স্বরাজ্য দল লইয়া সারা ভারতে তিনি প্রচারকার্য্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহার ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ দেখিয়া কংগ্রেস পর্য্যন্ত তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিল।

সেই বৎসরে কাউন্সিল নির্বাচনে দেশবাসী প্রত্যক্ষভাবে দেখিল, দেশবন্ধুর প্রভাব কতদূর। তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে তখন দেশ মুগ্ধ এবং একথা বলা খুব অন্যায় হইবে না যে, সেদিন দেশবন্ধু দেশের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন যে, ভাঙ্গা তরবারি দিয়াই যেন তিনি বিরাট সংগ্রাম অনায়াসে জয় করিলেন।

১৯১৬ সালে যখন ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু কলিকাতায় আসেন, তখন হঠাৎ একদিন চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে লাট-ভবন হইতে টেলিফোন আসিল যে, সরকার বাহাদুর তাঁহার সহিত লাট-ভবনে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। লাট-ভবনের সহিত চিত্তরঞ্জনের কোনও সংস্রব ছিল না। হঠাৎ এই আহ্বানে তিনি কৌতূহলী হইয়া উক্ত-দিন লাট-ভবনে নিমন্ত্রণে গেলেন। সেখানে গিয়া বুঝিলেন যে, মণ্টেগুর সহিত আলাপের জন্যই এই আহ্বান।

কিছুক্ষণ আলাপের পর মিঃ মণ্টেগু বলিলেন—"স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভারতবাসী এখনও শিক্ষিত হয় নাই।"

তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিয়া সেদিন চিত্তরঞ্জন উত্তর দিয়াছিলেন,— "যদি এই একশো পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের শিক্ষার ভার নিয়ে তোমরা আমাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত না করে থাক, তবে সে দোষ কার?"

দেশবন্ধুর দানের কথা প্রথমেই বলিয়াছি। তিনি গোপনে দান করিতে ভালবাসিতেন। ব্যক্তিগত দান ব্যতীত বাঙ্গলা দেশের বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার দানে সমৃদ্ধ। ১৯১৫ সালে শেষ-জীবনে তিনি তাঁহার বাস-ভবন পর্য্যন্ত জাতির সেবায় উৎসর্গ করেন। তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে আজ সেখানে "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জীবনের শেষ দিকে দেশবন্ধুর শরীর একদম ভাঙিয়া পড়ে। ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের পর তিনি অসুস্থ হইয়া দার্জিলিঙ যান। কেহই তখন ভাবে নাই যে, হিমালয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তাঁহার প্রিয় অনুচরকে এইভাবে আপনার ক্রোড়ে ডাকিয়া লইবেন। সেইখানেই ১৯২৫ সালের

১৬ জুন "ষ্টেপ্ এসাইড্" নামক ভিলাতে দেশবন্ধু দেহরক্ষা করেন।

লোকে যখন এই মর্মান্তিক সংবাদ শুনিল…তখন যে দেশবন্ধুকে কখনও দেখে নাই, সেও মনে করিল, তাহার নিকটতম আত্মীয় আর নাই।

[—**নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়**]

অনুশীলনী

১। স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হবার আগে কোন ঘটনাক্রমে দেশবন্ধু স্বাদেশিকতার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়েন?

২। ছাত্রাবস্থায় এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার আগে ইংলণ্ডে থাকার সময়ে দেশবন্ধুর স্বদেশপ্রীতির কোন্ পরিচয় পাওয়া যায়?

৩। 'দেশবন্ধু' নামের সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

৪। চিত্তরঞ্জন বিলাত থেকে দেশে ফিরে আসার পর "বাঙালীর অন্তরে এক মহা পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছিল"—সেই পরিবর্তনের কথা এবং তাকে সার্থক করে তোলার সাধনার কথা বিশদ করে বল। চিত্তরঞ্জন কেমন করে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন?

৫। পদ-পরিবর্তন কর :—অধ্যবসায়; সংঘটিত; দারিদ্র; বিস্তৃত।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—সফল; স্বপক্ষ; অন্তর; প্রত্যক্ষ; শত্রু; প্রচ্ছন্ন।

৭। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—ছাত্রাবস্থায়; ইচ্ছানুযায়ী; সপ্তাশ্ব; অর্থাগম; শোকাশ্রু।

৮। শব্দার্থ দাও :—অধ্যবসায়; নিষ্ঠা; সমারোহ; অভিনন্দন; ক্ষিপ্ত; নিঃস্ব; মর্মান্তিক; ঐকান্তিকতা; প্রতীয়মান; প্রেরণা; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা; সংস্রব; প্রচ্ছন্ন।

৯। টীকা লেখ :—দেউলিয়া; শুনানি; এজলাস; অসহযোগ-নীতি; স্বায়ত্তশাসন; সপ্তাশ্বরথ; কাউন্সিল।

১০। প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ বল ও বাক্য গঠন কর :—
সংগঠন/সংঘটন; লক্ষ/লক্ষ্য; কোটি/কটি; চির/চীর; দিন/দীন।

১১। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "এই যে নবজাগরণ……তবে প্রচ্ছন্নভাবে।"

(খ) "যদি এই একশো পঞ্চাশ……দোষ কার?"

(গ) "ভাঙা তরবারি দিয়াই……জয় করিলেন।"
(ঘ) "ভিখারীর সে কি রাজ মহিমা!"

১২। নিম্নলিখিত দেশনেতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
স্বরেন্দ্রনাথ; দাদাভাই নাওরোজী; শ্রীঅরবিন্দ; বারীন্দ্রকুমার।

১৩। "অসহযোগ আন্দোলন" সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে বল।

১৪। নিচের শব্দগুলির দ্বারা বিভিন্ন অর্থবহ বাক্য সমূহ রচনা কর :—
দণ্ড; হাত; অর্থ।

Character sketch of Jeshavan Sh



[১৮৬৩ সাল থেকে ১৯১৩ সাল—এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল নানাভাবে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে গেছেন। বিলেত-ফেরৎ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েও তিনি মনে-প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁর রচনায় স্বাদেশিকতা এবং স্বাধীনতার স্বর সর্বদাই প্রাধান্য পেয়েছে। নাটক এবং হাসির গান (স্বর সহ) রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং প্রধানতঃ নাট্যকার ও ব্যঙ্গগীতি রচয়িতা হিসাবেই ডি. এল. রায় নামে তাঁর খ্যাতি আজও অম্লান। জাতীয়তামূলক গান এবং সমস্বরে সেই সব গান গাইবার মতো স্বর রচনায় তিনি পুরোধা।

'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকের প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্যের শেষাংশটি নিচে দেওয়া হলো।]

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত ভয়াবহ পরিত্যক্ত বন। কাল—প্রভাত।

[রাণা প্রতাপসিংহ একাকী দণ্ডায়মান। এই সময়ে
শক্তসিংহ সেস্থানে প্রবেশ করিলেন।]

প্রতাপ। দেখে এলে ?

শক্ত। হাঁ দাদা।

প্রতাপ। কি দেখলে ?

শক্ত। স্থান পরিত্যক্ত।

প্রতাপ। জনমানব নাই ?

শক্ত। জনমানব নাই।

প্রতাপ। কারণ ?

শক্ত। কারণ জিজ্ঞাসা করবার লোক নাই।

প্রতাপ। মন্দিরের পুরোহিত কোথায় ? তিনি মোগল-সৈন্যের আগমন-সংবাদ আমায় দিয়েছিলেন। তিনি কোথায় ?

শক্ত। আবাসে নাই।

প্রতাপ। তবে আমাদের আগমন নিষ্ফল।

শক্ত। নিষ্ফল কেন ? এখানে অনেক বন্যপশু আছে। এস ব্যাঘ্র-শিকার করি।

প্রতাপ। শেষে ব্যাঘ্র-শিকার !

শক্ত। নৈলে আর কি করা যায় ! এমন সুন্দর প্রভাত, এমন নিস্তব্ধ অরণ্য, এমন ভয়াবহ নির্জন পথ। এ সৌন্দর্য্য পূর্ণ করতে রক্ত চাই। যখন মনুষ্য-রক্ত পাচ্ছিনা, তখন পশুর রক্তপাত করা যাক।

প্রতাপ। বিনা উদ্দেশ্যে রক্তপাত !

শক্ত। ভল্ল নিক্ষেপ করাই উদ্দেশ্য হোক। আজ দেখবো দাদা, কে ভল্ল নিক্ষেপ কর্তে ভালো পারে—তুমি কিংবা আমি।

প্রতাপ। প্রমাণ কর্তে চাও ?

শক্ত। হাঁ। [স্বগত] দেখি, তুমি কি স্বত্বে মেবারের রাণা, আমি যার কৃপাদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট।

প্রতাপ। আচ্ছা চল। তাই প্রমাণ করা যাক। শিকার, ক্রীড়া দুই-ই হবে।

[উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

দৃশ্য পরিবর্তন—বনান্তর।

[প্রতাপ ও শক্ত একটি মৃত ব্যাঘ্রদেহ পরীক্ষা করিতেছেন।]

প্রতাপ। ও বাঘ আমি মেরেছি।

শক্ত। আমি মেরেছি।

প্রতাপ। এই দেখ আমার ভল্ল।

শক্ত। এই আমার ভল্ল।

প্রতাপ। আমার ভল্লে ও মরেছে।

শক্ত। আমার ভল্লে।

প্রতাপ। আচ্ছা, চল ঐ বন্য-বরাহ লক্ষ্য করি।

শক্ত। সমান দূর থেকে মার্তে হবে।

প্রতাপ। আচ্ছা।

[উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

দৃশ্য পরিবর্তন—বনান্তর

[প্রতাপ ও শক্ত]

শক্ত। বরাহ পালিয়েছে।

প্রতাপ। তবে কারও ভল্ল লাগেনি।

শক্ত। না।

প্রতাপ। তবে কিছুই প্রমাণ হোলো না—আজ থাক, বেলা হয়েছে। আর একদিন দেখা যাবে।

শক্ত। আর একদিন কেন দাদা! আজই প্রমাণ হয়ে যাক্ না।

প্রতাপ। কি রকমে?

শক্ত। এস, পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করি।

প্রতাপ। সে কি শক্তসিংহ?

শক্ত। ক্ষতি কি ?

প্রতাপ। না শক্ত—কাজ নাই, এতে লাভ কি হবে ?

শক্ত। লোকসানই বা কি ? দ্বন্দ্ব দেহের একটু রক্তপাত বৈ ত নয়, দেহে বর্ম আছে। মর্বে না কেউ-ই—ভয় কি ?

প্রতাপ। মর্বার ভয় করিনা শক্ত।

শক্ত। না—না, নেও ভল্ল! আমরা দু'জনে আজ নররক্ত নিতে বেরিয়েছি—অন্ততঃ ফোঁটা দুই নররক্ত চাই। নেও ভল্ল, নিক্ষেপ কর। [চীৎকার করিয়া] নিক্ষেপ কর।

প্রতাপ। উত্তম—নিক্ষেপ কর।

শক্ত। একসঙ্গে নিক্ষেপ কর।

[উভয়ে ভূমিতলে তরবারি রাখিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে প্রতাপের কুলপুরোহিত প্রবেশ করিয়া উভয়ের অন্তর্বর্তী হইয়া কহিলেন—]

পুরোহিত। একি! ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব! ক্ষান্ত হও।

শক্ত। না—না ব্রাহ্মণ! দূরে থাক! নইলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

পুরোহিত। মৃত্যুকে ভয় করি না—ক্ষান্ত হও।

শক্ত। কখনও না। নররক্ত নিতে বেরিয়েছি। নররক্ত চাই।

পুরোহিত। নররক্ত চাও ? এই নাও, আমি দিচ্ছি।

[এই বলিয়া পুরোহিত ভূমি হইতে শক্তের পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া স্বীয় বক্ষে তরবারি আঘাত করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন।]

প্রতাপ। এ কি গুরুদেব! কি কর্লে তুমি!

পুরোহিত। কিছু না! প্রতাপ! শক্ত! তোমাদের ক্ষান্ত করবার জন্য এ কাজ করেছি।

প্রতাপ। কি কর্লে শক্ত?

শক্ত। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] সত্যই ত! কি কর্লাম!

প্রতাপ। শক্ত! তোমার জন্যই সম্মুখে এই ব্রহ্মহত্যা হলো। শুনেছিলাম যে, তোমার কোষ্ঠীতে আছে যে, তুমিই একদিন মেবারের সর্বনাশের কারণ হবে। এতদিন তা বিশ্বাস হয়নি। আজ বিশ্বাস হলো!

শক্ত। আমার জন্য এই ব্রহ্মহত্যা হোলো!

প্রতাপ। তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে, আমি আদর করে, মেবারে এনেছিলাম। কিন্তু মেবারের সর্বনাশের হেতুকে আর মেবারে রাখতে পারি না। তুমি এই মুহূর্তে রাজ্য পরিত্যাগ কর।

শক্ত। উত্তম!

প্রতাপ। যাও। আমি এখন এ ব্রাহ্মণের সৎকারের ব্যবস্থা করি; পরে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব। যাও।

[উভয়ে বিপরীত দিকে প্রস্থান করিলেন।]

[**—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়**]

অনুশীলনী

১। প্রতাপ ও শক্তের চরিত্রের মধ্যে কি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

২। কেবল ব্রহ্মহত্যার কারণ হয়েছিলেন বলেই কি শক্তসিংহকে প্রতাপ নির্বাসিত করলেন?

৩। কোন কারণে এবং কোন অবস্থায় কুলপুরোহিত নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন, নিজের ভাষায় লেখ।

৪। শব্দগুলি সম্পর্কে নির্দেশমত প্রশ্নের উত্তর নিচের ছক্ অনুসারে লেখ :—
পূর্ণ, নিষ্ফল, সুন্দর, মৃত্যু, বিশ্বাস।

শব্দার্থ লিখ					
পদ-নির্ণয় কর					
পদ-পরিবর্তন কর					
বিপরীত শব্দ লিখ					
বাক্য-রচনা কর					

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—
"তোমাকে— —, আমি— করে, —এনেছিলাম। কিন্তু— সর্বনাশের —আর— — পারি না।"

৬। কোনটি কোন বচন ও কোন লিঙ্গ তাহা বল :—
বরাহ ; ভল্ল ; পুরোহিত ; সৈন্যগণ।

৭। লিঙ্গান্তর কর :—ব্রাহ্মণ ; দাদা ; বাঘ ; ব্যাঘ্র।

৮। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—পরস্পর, নিস্ফল।

৯। ব্যাখ্যা লেখ :—
(ক) "তুমি কি স্বপ্নে মেবারের রাণা, ... অন্নে পরিপুষ্ট।"
(খ) "মেবারের সর্বনাশের হেতুকে......রাখতে পারি না।"

১০। স্থূলাক্ষরে লিখিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—
(ক) "**দেহের** একটু রক্তপাত বৈ ত নয়। **দেহে** বর্ম আছে।"
(খ) "মৃত্যুকে ভয় করি না— —ক্ষান্ত হও।"

A Story of self sacrifice

ব্যবধান

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই মে, বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ লিখে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। গল্প, উপন্যাস, দিন-লিপি, ভ্রমণ-কাহিনী, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, গীতি-কাব্য, গান, সমালোচনা প্রভৃতি সকল বিষয়েই বই লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বাড়িয়েছেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট, বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ, রাখী-পূর্ণিমার দিনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।]

সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশুমালী উভয়ে মামাতো পিসতুতো ভাই; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে

মেলে। কি ইহাদের দুই পরিবার বহুকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এইজন্য ইহাদের সম্পর্ক নিতান্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বনমালী হিমাংশুর চেয়ে অনেক বড়। হিমাংশু যখন দন্ত এবং বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই, বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কান্না থামাইয়াছে, ঘুম পাড়াইয়াছে।

বনমালী লেখা-পড়া বড় একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের সখ ছিল এবং এই দূর সম্পর্কের ছোট ভাইটি ছিল। ইহাকে খুব একটি দুর্লভ দুমূল্য লতার মতো বনমালী হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ সিঞ্চন করিয়া পালন করিতেছিল। এবং সে যখন তাহার সমস্ত অন্তর বাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া লতাইয়া উঠিতে লাগিল, তখন বনমালী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

হিমাংশুর বয়স যখন আর একটু বাড়িল, তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিস্তর তারতম্য সত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন ছোট বড় কিছু ছিল না।

এইরূপ হইবার একটু কারণও ছিল। হিমাংশু লেখা-পড়া করিত; বই পাইলেই পড়িতে বসিত। বনমালী বিশেষ একটু শ্রদ্ধার সহিত তাহার কথা শুনিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোট বড় সকল কথার আলোচনা করিত, কোন বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না।

বাগানের সখও হিমাংশুর ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রভেদ ছিল। বনমালীর ছিল হৃদয়ের সখ, হিমাংশুর ছিল বুদ্ধির সখ। পৃথিবীর এই কোমল গাছপালাগুলি, এই অচেতন জীবনরাশি, যাহারা যত্নের কোনো লালসা রাখে না, অথচ যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগুলির মতো বাড়িয়া উঠে, যাহারা মানুষের শিশুর চেয়েও শিশু, তাহাদিগকে

সযত্নে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বনমালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশুর গাছপালার প্রতি একটি কৌতূহল-দৃষ্টি ছিল। অঙ্কুর গজাইয়া উঠে, কিশলয় দেখা দেয়, কুঁড়ি ধরে, ফুল ফুটিয়া উঠে, ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজ বপন, কলম করা, সার দেওয়া, চানক তৈরি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। দ্বারের সম্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাঁধানো বেদীর মতো ছিল। চারটে বাজিলেই একটি পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া, গুড়গুড়ি লইয়া বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বসিত। কোনো বন্ধু-বান্ধব নাই, হাতে একখানি বই কিম্বা খবরের কাগজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিত এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখনো বা দক্ষিণে কখনো বামে দৃষ্টিপাত করিত।

অবশেষে যখন হিমাংশু স্কুল হইতে ফিরিয়া, জল খাইয়া, হাতমুখ ধুইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনি তাহার আগ্রহ দেখিয়া বুঝা যাইত এতক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দুইজনে বেঞ্চির উপর বসিত—দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত, কোনো দিন বা বাতাস বহিত না, গাছপালাগুলি ছবির মতো স্থির দাঁড়াইয়া রহিত; মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগুলি জ্বলিতে থাকিত।

হিমাংশু কথা কহিত, বনমালী চুপ করিয়া শুনিত। যাহা বুঝিত না, তাহাও তাহার ভালো লাগিত। এমন শ্রদ্ধাবান বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত। সে কতক পড়িয়া বলিত, কতক বা ভাবিয়া বলিত, কতক বা

উপস্থিত মতো তাহার মাথায় যোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহায়তায় জ্ঞানের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক কথা ঠিক বলিত, অনেক বেঠিক কথাও বলিত; কিন্তু বনমালী গম্ভীরভাবে শুনিত, মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা বলিত, হিমাংশু তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বুঝাইত তাহাই বুঝিত এবং তাহার পরদিন ছায়ায় বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেই সকল কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝখানে জল যাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিলেবুর গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে, তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িবার চেষ্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে এবং উভয় পক্ষে যে গালাগাল বর্ষিত হয়, তাহাতে যদি কিছুমাত্র বস্তু থাকিত, সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে তাহাই লইয়া ঘোর বিপদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষ নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকিল ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল, সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল, ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের জিত হইল। প্রমাণ হইয়া গেল নালা তাহারি এবং পাতিলেবুতে আর কাহারো কোন অধিকার নাই। আপীল হইল, কিন্তু নালা এবং পাতিলেবু হরচন্দ্রের রহিল।

যতদিন মোকদ্দমা চলিতেছিল দুই ভাইয়ের বন্ধুত্বে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। যেদিন আদালতে হরচন্দ্রের জিত হইল, সেদিন বাড়ীতে

বিশেষতঃ অন্তঃপুরে পরম উল্লাস পড়িয়া গেল; কেবল বনমালীর চক্ষে ঘুম রহিল না। তাহার পরদিন অপরাহ্ণে সে এমন ম্লানমুখে সেই বাগানের বেদীতে গিয়া বসিল, যেন পৃথিবীর আর কাহারো কিছু হয় নাই, কেবল তাহারি একটা মস্ত হার হইয়া গেছে।

সে দিন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু হিমাংশু আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশুদের বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল আলনার উপরে স্কুলের ছাড়া কাপড় ঝুলিতেছে; অনেকগুলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল হিমাংশু বাড়িতে আছে। গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বিষণ্ণ মুখে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশু বাগানে আসিল না।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে বনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশুর বাড়িতে গেল। গোকুলচন্দ্র দ্বারের কাছে বসিয়া তপ্তদেহে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কেও।" বনমালী চমকিয়া উঠিল। যেন সে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে। কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "মামা, আমি।" মামা বলিলেন, "কাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছ? বাড়িতে কেহ নাই।"

বনমালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল, দেখিল হিমাংশুদের বাড়ীর জানালাগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল; দরজার ফাঁক দিয়া যে দীপালোকরেখা দেখা যাইতেছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে বনমালীর মনে হইল, হিমাংশুদের বাড়ীর সমুদায় দ্বার তাহারই নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

Has a trifle spoils pleasure

[—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

অনুশীলনী

১। গল্পটি নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

২। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও বনমালীর সঙ্গে হিমাংশুমালীর বন্ধুত্ব হলো কেমন করে ?

৩। বনমালী ও হিমাংশুমালীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল কি সূত্রে ?

৪। "তাহার আগ্রহ দেখিয়া বুঝা যাইত……সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়াছিল।"

এবং

"তাহার পরদিন অপরাহ্নে সে এমন ম্লানমুখে সেই বাগানের বেদীতে গিয়া বসিল……"—বনমালীর এই অবস্থান্তরের কারণ কি ?

৫। বনমালী ও হিমাংশুমালীর স্বভাবের পার্থক্য বর্ণনা কর।

৬। শব্দার্থ লেখ :—ব্যবধান ; ঘনিষ্ঠ ; বাক্যস্ফূর্তি ; দুর্লভ ; দুর্মূল্য ; স্নেহ-সিঞ্চন ; অঙ্কুর ; তারতম্য ; প্লাবন ; চাতক ; মর্মরিত ; মহারথী ; প্রবৃত্তি ; প্রত্যাশা।

৭। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "….. এবং উভয় পক্ষে…… ভরাট হইয়া যাইত।"

(খ) "উভয় পক্ষে যে টাকাটা………কখনও বহে নাই।"

(গ) "…… যেন পৃথিবীর …… হার হইয়া গেছে।"

(ঘ) "অন্ধকার রাত্রে ……… একলা পড়িয়া রহিল।"

৮। সমার্থক শব্দ দাও :—পৃথিবী ; গাছ ; বই ; অন্ধকার।

৯। পার্থক্য কি তাহা বল :—দ্বার/দার ; দীপ/দ্বীপ/দ্বিপ।

১০। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—

অন্তর ; যত্ন ; আকর্ষণ ; অন্ধকার ; উপরে ; দুর্লভ।

১১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে নিচের ছকে নির্দেশমত সাজাও :—

(ক) বনমালী এবং হিমাংশুমালী উভয়ে মামাতো পিসতুতো ভাই ;

সে-ও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে মেলে।

(খ) তাহার বাগানের সখ ছিল এবং এই দূর সম্পর্কের ছোট ভাইটি ছিল।

উদ্দেশ্য		বিধেয়	
উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের প্রসারক	বিধেয়	বিধেয়-প্রসারক



[দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের পিতা। দেশের লোক এঁকে 'মহর্ষি' নামে জানত। দেবেন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হলেও, তাঁর দুর্গম পথে ভ্রমণের শখ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের বন্ধু ছিলেন। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জ্ঞান ও ঐতিহ্য রক্ষা হয় এই তিনি চাইতেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন।

এই অংশটি তাঁর আত্মচরিতের প্রথমাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই ভ্রমণের কাল ছিল ১৮৫৭, সিপাহী-আন্দোলনের বছর, তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ।]

আমি শিমলাতে আসিয়া কিশোরীনাথ চাটুয্যেকে বলিলাম, "আমি সপ্তাহের মধ্যে আরো উত্তর দিকে উচ্চ উচ্চ পর্বত ভ্রমণে যাইব।

আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। আমার জন্য একটা ঝাঁপান আর তোমার জন্য একটা ঘোড়া ঠিক করিয়া রাখ।"

"যে আজ্ঞা।" বলিয়া তাহার উদ্যোগে সে চলিল। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ দিবস শিমলা হইতে যাত্রা করিবার দিন স্থির ছিল। আমি সে দিবস অতি প্রত্যুষে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ঝাঁপান আসিয়া উপস্থিত, বাঙ্গীবর্দারেরা সব হাজির।

আমি কিশোরীকে বলিলাম, "তোমার ঘোড়া কোথায়?" "এই এল বলে, এই এল বলে।" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া পথের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক ঘণ্টা চলিয়া গেল তবু তাহার ঘোড়ার কোন খবর নাই। আমি বুঝিলাম যে অধিক শীতের ভয়ে আরো উত্তরে কিশোরী আমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক।

আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি মনে করিতেছ যে তুমি আমার সঙ্গে না গেলে, আমি একাকী যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে চাই না, তুমি এখানে থাক। তোমার নিকট পেটরায় ও বাক্সের যে সকল চাবি আছে, তাহা আমাকে দাও।"

আমি তাহার নিকট হইতে সেই সকল চাবি লইয়া ঝাঁপানে বসিলাম। বলিলাম, "ঝাঁপান উঠাও।" আমি আনন্দে উৎসাহে বাজার দেখিতে দেখিতে শিমলা ছাড়াইলাম।

...তথা হইতে ক্রমে পর্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেই পর্বত একেবারে প্রাচীরের ন্যায় সোজা হইয়া এত উচ্চে উঠিয়াছে যে সেখান হইতে নিচের খদের কেলুগাছকেও ক্ষুদ্র চারার মত বোধ হইতে লাগিল। নিকটেই গ্রাম, সেই গ্রাম হইতে বাঘের মত কতকগুলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আইল। দুই প্রহরের পর একটা শূন্য পান্থশালা পাইয়া সে দিনের জন্য সেইখানেই অবস্থিতি করিলাম।

আমার সঙ্গে রন্ধনের লোক নাই। ঝাঁপানীরা বলিল, "হাম-লোককা রোটি বড় মিঠা হ্যায়।" আমি তাহাদের নিকট হইতে

তাহাদের মক্কা যব মিশ্রিত একখানা-রুটি লইয়া, তাহারই একটু খাইয়া সে দিন কাটাইলাম। খানিক পরে কতকগুলা পাহাড়ী আসিয়া নানা প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া আমোদে নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাদের এক জনের দিকে তাকাইয়া দেখি যে তাহার নাক নাই। সে বলিল; "ঐ পথে ভালুক আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইতে গিয়া সে থাবা মারিয়া আমার নাকটা উঠাইয়া লইয়াছে।" সেই ভাঙ্গা মুখ লইয়া তাহার কতই নৃত্য, কতই তাহার আমোদ !...পরদিন প্রাতঃকালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপরাহ্নে একটা পর্বতের চূড়ায় যাইয়া অবস্থান করিলাম। সেখানে গ্রামের অনেকগুলা লোক অসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। তাহারা বলিল, "আমাদের এখানে বড় ক্লেশে থাকিতে হয়। বরফের সময় এক হাঁটু বরফ ভাঙ্গিয়া সর্বদাই চলিতে হয়। ক্ষেতের সময় শূকর ও ভালুক আসিয়া সব ক্ষেত নষ্ট করে। রাত্রিতে মাচার উপর থাকিয়া আমরা ক্ষেত রক্ষা করি।"

আমি সেদিন সেই চূড়াতেই থাকিয়া প্রভাতে সেখান হতে চলিয়া গেলাম। এই দিন দুই প্রহর পর্যন্ত চলিয়া ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। বলিল, "পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর ঝাঁপান চলে না।" আমি সেই ভাঙ্গা পথের উপর দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম ...একজন পিছনের দিকে আমার কোমরটার অবলম্বন হইয়া ধরিয়া রহিল। তিন ঘণ্টা এইরূপ করিয়া চলিয়া সেই ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করিলাম। শিখরে উঠিয়া একটি ঘর পাইলাম। সে ঘরে একখানা কৌচ ছিল, আমি আসিয়াই তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। আরো উপরে উঠিয়া সেই দিন নারকাণ্ডাতে উপস্থিত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্যে দিয়া গিয়াছে। পর্বতের উপর আরোহন করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিতবর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষসকল দেখিতে

পাই। তাহাতে একটি পুষ্প বা একটি ফলও নাই। কিন্তু পর্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণ-লতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, তাহাদের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্তমান বোধ হইল।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। বনের অন্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম; পুনর্বার সেখানে পক্ব গোধূম যবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলাম। রৌদ্রের জন্য পুনর্বার ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় দুই প্রহরের সময় বোয়ালি নামক পর্বতে উপস্থিত হইলাম। বোয়ালি পর্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে এবং তাহা রৌপ্য-পত্রের ন্যায় সূর্য-কিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে।

গতকল্য সুঙ্গ্রী হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া বোয়ালিতে আসিয়াছিলাম। অদ্যও তদ্রূপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া অপরাহ্ণে নগরী নদী-তীরে উপস্থিত হইলাম। ইহার উভয় তীর হইতে দুই পর্বত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় অনেক উচ্চ পর্যন্ত সমান উঠিয়া পরে পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে।

এই নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু ঝুলিতেছে, আমি সেই সেতু দিয়া নদীর পরপারে গিয়া একটি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন বাঙ্গালাতে বিশ্রাম করিলাম। এই উপত্যকা-ভূমি অতি রম্য ও অতি জনবিরল। ইহার দশ ক্রোশ মধ্যে একটি লোক নাই, একটি গ্রাম নাই।

এখানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া কেবল একটি ঘরে একজন মনুষ্য বাস করিতেছে। সে তো ঘর নহে, সে পর্বতের গহ্বর—সেখানেই তাহারা রন্ধন করে, সেখানেই তাহারা শয়ন করে। দেখি যে তাহার স্ত্রী একটি শিশুকে পিঠে নিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে; তাহার আর একটি ছেলে পর্বতের উপরে সঙ্কট স্থান দিয়া হাসিয়া হাসিয়া দৌড়া-

দৌড়ি করিতেছে। তাহার পিতা একটি ছোট ক্ষেত্রে আলু চাষ করিতেছে। এখানে ঈশ্বর তাহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই।

আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি পর্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নি-বাণের ন্যায় নক্ষত্র-বেগে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া, নদীতীর পর্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষ সকলকে আক্রমণ করিল।

ক্রমে একে একে সমুদায় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি-রূপ ধারণ করিল এবং অন্ধ তিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে, তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমি পূর্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষ সকল দেখিয়াছি এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্বতের প্রজ্জলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, উন্নতি, নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, আমার বড়ই আহ্লাদ হইল।

সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল; রাত্রিতে যখনই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখনি তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এবং উৎসব রজনীর প্রভাতকালের অবশিষ্ট দীপালোকের ন্যায় মধ্যে মধ্যে সর্বভুক লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে।

আমি সেই নদীতে যাইয়া স্নান করিলাম। ঘটি করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম। সে জল এমনি হিম যে, বোধ হইল যেন মাস্তিষ্ক জমিয়া গেল। স্নান ও উপাসনার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলাম।

প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া

দুই প্রহরের সময় দারুণ-ঘাট নামক দারুণ উচ্চ পর্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়া যে সম্মুখে আর এক নিদারুণ উচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ তুষারাবৃত হইয়া উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয় ঈশ্বরের মহিমা উন্নত মুখে ঘোষণা করিতেছে।

আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দারুণ-ঘাটে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত তুষারাবৃত পর্বত-শৃঙ্গের আশ্লিষ্ট মেঘাবলী হইতে তুষার-বর্ষণ দর্শন করিলাম। আষাঢ় মাসে তুষার-বর্ষণ শিমলাবাসীদিগের পক্ষেও আশ্চর্য, যেহেতু চৈত্র মাস শেষ না হইতে হইতেই শিমলা পর্বত তুষার-জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসন্ত-বেশ ধারণ করে।

২রা আষাঢ় এই পর্বত হইতে অবরোহণ করিয়া সিরাহন নামক পর্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রাণার একটি অট্টালিকা আছে। গ্রীষ্মকালে রামপুরে অধিক উত্তাপ হইলে কখন কখন শীতল বায়ু সেবনার্থে রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে পর্বত-তলে আমাদিগের দেশ অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ হয়; পর্বত চূড়াতেই বারো মাস শীতল বায়ু বহিতে থাকে।

৪ঠা আষাঢ় এখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৩ই আষাঢ় ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমার শিমলার প্রবাস ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া ঘা মারিলাম। কিশোরী দরজা খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "তোমার মুখ যে একেবারে কালি হইয়া গিয়াছে।"

সে বলিল, "আমি এখানে ছিলাম না, যখন আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিলাম এবং আপনার সঙ্গে যাইতে পারিলাম না, তখন আমি অনুশোচনা ও অনুতাপে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমি আর এখানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি পর্বত হইতে নামিয়া জ্বালামুখী চলিয়া গেলাম। জ্বালামুখীর অগ্নির তাপে, জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের তাপে আমার শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। আমি তাই কালামুখ হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার আশা নাই যে আপনি আর আমাকে আপনার নিকট রাখিবেন।"

আমি বসিয়া বলিলাম, "তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যেমন আমার কাছে ছিলে, তেমনি আমার কাছে থাক।"

[—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। (ক) হিমালয়ের কোন অঞ্চলে ও কাহার সঙ্গে লেখক ভ্রমণ করিতে গিয়েছিলেন ? তাঁহার সঙ্গী কিশোরী তাঁহার সহযাত্রী হলেন না কেন ?
   (খ) নিজের ভাষায় ভ্রমণ-বৃত্তান্তের প্রাকৃতিক বর্ণনা দাও।
   (গ) ঐ অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের সম্বন্ধে কি জানা গেল ?
   (ঘ) লেখক ভ্রমণকালে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন ? তাহার বর্ণনা দাও।

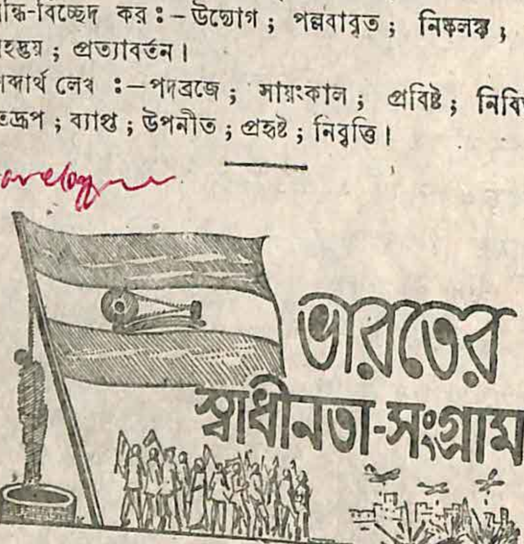
২। পদ-পরিবর্তন কর :—সৌন্দর্য ; লাবণ্য ; ক্রমিক ; আহ্লাদ ; মোহিত ; অবসন্ন ; আশ্লিষ্ট।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—অদূর ; আরোহণ।

৪। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—উদ্যোগ ; পল্লবাবৃত ; নিষ্কলঙ্ক ; তুষারাবৃত ; মহত্ত্ব ; প্রত্যাবর্তন।

৫। শব্দার্থ লেখ :—পদব্রজে ; সায়ংকাল ; প্রবিষ্ট ; নিবিড় ; বিরল ; তদ্রূপ ; ব্যাপ্ত ; উপনীত ; প্রহৃষ্ট ; নিবৃত্তি।

A travelogue



[লেখিকা বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিতা। এঁর লেখা বহু প্রবন্ধ বিশেষ করে, জাতীয় সংগ্রামের ওপর লেখা প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হয়।]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার মারফতে

আমাদের দেশের অনেক গণ্যমান্য লোক স্বাধীনতার দাবি না হউক, মানুষের মত সসম্মানে বাঁচিবার দাবী পেশ করিতে লাগিলেন বৎসর বৎসর। এইভাবে ক্রমে দেশে একটা জাতীয়তার ও দেশভক্তির জাগরণ হইল।

এমন সময়ে লর্ড কার্জনের বিধানে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। ইংরেজ সরকারের এই অবিচারে বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে যে জাতীয় জাগরণ ও আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, তাহাকেই স্বাধীনতা সমরের সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। ইংরেজের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনই সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। স্বাধীনতা যে আমাদেরও অধিগম্য হইতে পারে, এ বিষয়ে ভারতবাসী সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু কি উপায়ে তাহা অধিগম্য হইতে পারে উপযুক্ত নেতার অভাবে তাহা দেশের লোক স্থির করিতে পারে নাই। তাই কেহ কেহ বিলাতী পণ্য বর্জনকেই উপায় মনে করিলেন, কেহ কেহ জাতীয় মহাসমিতির মধ্য দিয়া অনবরত দাবি পেশ করিয়া ইহা অধিগম্য হইবে মনে করিলেন। কেহ কেহ মনে করিলেন, একটি একটি করিয়া অধিকার আদায় করিয়া ক্রমে স্বরাজে পৌঁছিবেন আবার কেহ কেহ গুপ্ত অস্ত্র নির্মাণ ও সংগ্রহ করিয়া গুপ্তহত্যার দ্বারা ইংরেজ শাসনকে অচল করিয়া তুলিবেন, ইহাই মনে করিয়া জীবন বিপন্ন করিলেন। এদিকে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি সমানে চলিতে লাগিল। ইহাতে আন্দোলন বহুগুণে বাড়িয়া গেল এবং ভারতময় ছড়াইয়া পড়িল।

এমন সময়ে আসিলেন জাতীর পরিত্রাতা মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি বলিলেন—“একমাত্র অস্ত্র ‘অহিংস সত্যাগ্রহ’। বক্তৃতায় কিছু হইবে না, হিংসায় কিছু হইবে না, আবেদন-নিবেদনে কিছু হইবে না, শুধু বিলাতী পণ্য বর্জনে কিছু হইবে না। অন্যায়, অসত্য, অধর্মের পথেও কিছু হইবে না, আমরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিব না। আমরা ইংরেজের সকল অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে

সত্যাগ্রহী হইব।” দেশবাসী তাহার আহ্বানে সাড়া দিল। দেশের লোক স্বাধীনতা-সমর যোগ্য সেনাপতি পাইল।

এই মুক্তি-সংগ্রামে বাঙালীর দান অসাধারণ। বাঙালী মুক্তি-সাধকদের মধ্যে দুই ত্যাগবীরের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে একজন গুরু, আর একজন তাঁহার শিষ্য। আগে গুরুর কথা বলি—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন কবি, ভাবুক হৃদয়বান মহাপুরুষ। ইনি ছিলেন ভারত-বিখ্যাত ব্যারিস্টার। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করিলে তিনি তাঁহার ব্যারিস্টারি ত্যাগ করিয়া—সেই সঙ্গে একরূপ সর্বস্বই বিসর্জন দিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ান। দেশবন্ধুই বাংলাদেশে মহাত্মার বাণী ও মন্ত্র প্রচার করেন।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর সুযোগ্য শিষ্য। দেশের মুক্তি-সাধনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু এক সময়ে সংসারী লোক ছিলেন, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র ছিল। এই সাধক ছাত্রজীবন হইতে সাংসারিক জীবনের প্রতি উদাসীন। ইনি বিলাতে গিয়া সিভিল-সার্ভিস পাস করেন। সুভাষচন্দ্র দেশসেবার অপরাধে বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। বহু নিগ্রহই তিনি সহ্য করেন। এজন্য বারবার তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। সুভাষচন্দ্র দুই দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোনরূপ আপস করিতে চান নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা।

গান্ধীজী বললেন, “আমরা ইংরেজের সহিত সহযোগিতা করিব না। তাহার স্কুল-কলেজে পড়িব না, তাহার অফিস-আদালতে কাজ করিব না, তাহাকে ট্যাক্স-খাজনা দিব না, তাহার জিনিস কিনিব না, আইন মানিব না। তাই এই আন্দোলনের নাম হইল “অসহযোগ আন্দোলন”। দলে দলে সকলে পড়া ছাড়িয়া, চাকরি ছাড়িয়া, ব্যবসায় ছাড়িয়া এই আন্দোলনে যোগ দিল। পঁচিশ বছরের উপর এই

আন্দোলন চলিল। ইংরেজও প্রাণপণ করিয়া এই আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ লোককে জেলে দিল, হাজার হাজার লোককে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিল। কিন্তু এই আন্দোলনকে কোনমতেই দমন করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে ইউরোপে ইংরেজ ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল এবং সেই যুদ্ধ ক্রমশঃ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। ইউরোপে জার্মানির এবং এশিয়াতে জাপানের আক্রমণে ইংরেজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে বাংলার নেতা সুভাষচন্দ্র বসু এক নতুন পথে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হইলেন।

সুভাষচন্দ্র গোপনে দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়া জার্মানি ও জাপানের সাহায্যে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভারতবর্ষের বাহিরে যে সকল ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছিল, তিনি তাহাদের একত্র করিয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন।

নানা কারণে সুভাষচন্দ্রের এই আক্রমণ সফল হইল না। কিন্তু ইহাতে ইংরেজরা ভয় পাইয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিল, আর বেশিদিন ভারতবর্ষকে পরাধীন করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না।

যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষের ভিতরে বাহিরে সর্বত্রই যেভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলিয়াছিল, তাহাতে ইংরেজ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতেই হইবে।

ইতিমধ্যে দেশের একদল মুসলমান কংগ্রেসের বাহিরে একটা নূতন দল গঠন করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে একত্র থাকিতে চায় না। ভারতবর্ষের যে সকল জায়গায় মুসলমানের বাস বেশি আছে, সেইসকল জায়গাকে আলাদা করিয়া একটা নূতন দেশ গঠন করিতে হইবে। ইহা লইয়া দেশের সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হইল।

মহাত্মা গান্ধী দেশ ভাগ করিবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু

কংগ্রেসের নেতারা অশান্তি এড়াইবার জন্য দেশ ভাগ করায় আপত্তি করিলেন না।

অবশেষে তাহাই স্থির হইল। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ব প্রান্তে পূর্ববঙ্গ ও আসামের শ্রীহট্টকে লইয়া একটা নূতন দেশ গঠিত হইল। তাহার নাম হইল পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ ভারত এবং পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দিয়া নিজেদের দেশে ফিরিয়া গেল। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হইল।

[শ্রীসাধনা ভট্টাচার্য]

A bird's eye view of India's struggle for independence. (সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১। 'অসহযোগ-আন্দোলন' কি?

২। দেশবন্ধু কে? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৩। সংক্ষেপে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় দাও। তিনি কিভাবে স্বাধীনতা আনিবার চেষ্টা করেন?

৪। ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করে তাহা লেখ।

৫। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "স্বাধীনতা যে আমাদের······স্থির করিতে পারে নাই।"

(খ) "এই সময়ে বাংলার নেতা·········অগ্রসর হইলেন।"

৬। পদের পরিচয় দাও এবং বাক্য-রচনা কর :—জাগরণ; সচেতন; বিলাতী; অনবরত; বিপন্ন; অহিংস; সহযোগিতা; ভাবুক।

৭। টীকা লেখ :—

সত্যাগ্রহ; সিভিল সার্ভিস।

৮। যে সমস্ত অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইয়াছিল, তাহার পূর্বখণ্ডে কী রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

পদ্যাংশ



প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবি-পরিচিতি গদ্যাংশে দেখ]

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বাপিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।

২। কবি দেশের কোন আদর্শ রূপ মনে মনে দেখেছিলেন তার বর্ণনা দাও।

৩। আমাদের জাতির কোন কোন দোষের কথা নিয়ে কবি দুঃখ প্রকাশ করেছেন ?

৪। পদ-পরিবর্তন কর :—

মুক্ত ; খণ্ড ; কর্ম।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—

খণ্ড ; ক্ষুদ্র ; আনন্দ ; নির্দয় ; জাগরিত।

৬। শব্দার্থ দাও :—

দিবসশর্বরী ; বসুধা ; উৎস ; নির্বাপিত ; উচ্ছ্বসিয়া ; সহস্রবিধ ; চরিতার্থতা ; শতধা।

৭। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) "যেথা তুচ্ছ আচারের······ফেলে নাই গ্রাসী।"

(খ) "নিজ হস্তে·····················কর জাগরিত।"

৮। বাক্য-রচনা কর :—

উচ্ছ্বসিয়া ; শতধা ; দিবসশর্বরী ; স্রোতঃপথ।

———

An universal prayer.



—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[কবি-পরিচিতি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২১) বাঙলার একজন জনপ্রিয় কবি। ছন্দের কারিগরিতে তাঁর জোড়া মেলা ভার। বিজ্ঞান, পুরাণ, ইতিহাস, সমসাময়িক তথ্য ও ঘটনা—এমন প্রায় যাবতীয় বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। রবীন্দ্র-যুগের কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেও তাঁর কবিতার রূপ স্বতন্ত্র ছিল। 'কুহু ও কেকা', 'তীর্থ-সলিল', 'অভ্র-আবীর', 'মণি-মঞ্জুষা', 'বেলাশেষের গান'—তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম। বিদেশী কবিতার বাঙলা অনুবাদেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 'জাতির পাঁতি' কবিতাটিতে সকল মানুষের মধ্যে যে মূলগত একত্ব রয়েছে, কবি তারই জয়গান গেয়েছেন।]

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু, সে জাতির নাম 'মানুষ' জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত ; একই রবিশশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা সবাই আমরা সমান বুঝি !
কচি-কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি, বাঁচিবার তরে সমান যুঝি !
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো, জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবাই সমান রাঙা।
সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে, লাগিছে, লাগিবে দু'দিন পরে ;
মহামানবের পূজার লাগিয়া সবাই অর্ঘ্য রচনা করে।
মালাকার তার মাল্য যোগায়, গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়, নট তারে তোষে নৃত্যে গানে।
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়, গোয়ালা যোগায় ছানা ও ননী,
তাঁতীরা সাজায় চন্দ্রকোণায়, বণিকেরা তারে করিছে ধনী।

যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়, বিদ্বান তার ফোটায় আঁখি,
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য যোগায়, কিছু যেন জানা না রয় বাকি।
কেউ হেয় নাই, সমান সবাই, আদি জননীর পুত্র সবে ;
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কী ফল, জাতির তর্ক কেন গো তবে।
তরুণ যুগের অরুণ-প্রভাতে মহামানবের গাহ রে জয়,
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

Eulogy of Man

অনুশীলনী

১। জাতিভেদ সম্বন্ধে কবির কি মত বুঝিয়ে বল।
২। বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ কি ভাবে সমাজের সেবা করছে ?
৩। বাহ্যিক বা কর্মগত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ হিসাবে সকলেই যে অভিন্ন, কবিতার বক্তব্য অনুসরণ করে তা বুঝিয়ে বল।
৪। এই কথা কয়টির প্রয়োগ লক্ষ্য কর এবং তার বিশেষ অর্থ জেনে রাখ :—
বিশেষ—প্রভেদ, তারতম্য ; **চন্দ্রকোণায়**—হাতে বোনা বস্ত্রবিশেষ।
৫। পদ-পরিবর্তন কর :– লালিত ; ধনী ; রাঙা।
৬। লিঙ্গ-পরিবর্তন কর :—নট ; গোয়ালা।
৭। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :– বিদ্বান ; আদি।
৮। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—শীতাতপ।
৯। শব্দার্থ দাও :—নট ; তোষে ; শীতাতপ ; লালিত ; অঞ্জন ; মালাকার ; ডাঁটো ; সাঁজোয়া।
১০। টীকা লেখ :—গন্ধবেনে ; আদি জননী।
১১। ব্যাখ্যা কর :– "কালো আর ধলো·········সমান রাঙা।"
"মহামানবের পূজার··· ······রচনা করে।"
"মিছে কোলাহল··· ··· ···গাহ রে জয়,"
১২। নির্দেশমতো উত্তর লেখ :–

	তরুণ	বিদ্বান	তাঁতি
শব্দার্থ দাও			
পদ-পরিবর্তন কর			
লিঙ্গ-পরিবর্তন কর			

জীবন-ভিক্ষা



—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

[কবি-পরিচিতি—করুণানিধান (১৮৭৭—১৯৫৫) এগারো বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। শিক্ষকতা ও পরে ছাত্রাবাস পরিদর্শন করতেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গমঙ্গল' নামে দেশপ্রেমের কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। 'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধান-দূর্বা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এই কবিতাটি 'ধান-দূর্বা' থেকে সংকলিত।]

(বুদ্ধদেবের প্রতি কিসা গৌতমী)

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো, তুলালে আগলি বক্ষে,
উষ্ণ বিয়োগ-উৎস-সরিৎ দরবিগলিত চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন, চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন ;
অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণ শ্যেনের পক্ষে।
স্তনক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত ?
রসনা-প্রসূন কোন পরসাদ-মধুরসে পরিষিক্ত ?
মুখচম্পকে মরুর বর্ণ শুষ্ক অধর কমলপর্ণ—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযূষবিন্দুরিক্ত ?
কোথা সে মাধুরী আধো আধো বোলে ? কুন্দ-বৃন্ত ছিন্ন,
দন্তরুচিতে কই সে কান্তি পুণ্যহাসির চিহ্ন ?
জানি প্রভু, তব পাণির পরশে ননীর পুতলি জাগিবে হরষে
কোন পাষাণের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন ?
অবনীর এই পদ্মবেদীতে হরিলে ত্রিতাপদুঃখ,
যাত্রা করেছ দুরগম পথ ক্ষুরধার সম সূক্ষ্ম।

দিয়ে তপোবল, মহানির্বাণ, কুমারে আমার কর প্রাণদান।”
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে, আলুথালু কেশ রুক্ষ।
কহেন বুদ্ধ, “তনয় তোমার নীরব-সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চিরসুন্দর মরণের মহালগ্ন।
থাকে যদি কোথা অশোক-নিলয়, ভিখ্ মাগি আন সর্ষপচয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।”
বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা;
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে, “শিখাইলে শেষ শিক্ষা,
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার
হরো জগতের বিরহ-আঁধার, দাও গো অমৃতদীক্ষা।”

Death is inevitable — a tragic truth of life.

অনুশীলনী

১। দুঃখী মেয়েটি বুদ্ধদেবের কাছে কি ভিক্ষা করেছিল?

২। বুদ্ধদেব তা'কে “অশোক-নিলয়” থেকে “সর্ষপচয়” আনতে বললেন, তা সে পারল না কেন?

৩। সমস্ত ঘটনাটি নিজের ভাষায় বল।

৪। পদ-পরিবর্তন কর:—উষ্ণ; সুন্দর; মাধুরী।

৫। লিঙ্গ পরিবর্তন কর:—অভাগী; বিহগী; যুবতী; তনয়; দুলাল।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ দাও:—পাপ; সূক্ষ্ম; মরণ; বিশাল।

৭। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর:—তপোবল।

৮। শব্দার্থ দাও:—বিয়োগ-উৎস-সরিৎ; দরবিগলিত; শ্যেন; স্তনক্ষীরধার; রসনা-প্রসূন; পর্ণ; পীযূষ; রিক্ত; দন্তরুচি; কান্তি; পাণি; অবনী; ত্রিতাপ; নিলয়।

৯। টীকা লেখ:—ত্রিতাপদুঃখ; মহানির্বাণ; সমাধি; অমৃতদীক্ষা।

১০। ব্যাখ্যা কর:—“স্তনক্ষীরধার অধরে........পীযূষবিন্দুরিক্ত?”
“থাকে যদি কোথা......পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।”
“হরো জগতের..............অমৃতদীক্ষা।”

———



—কাজী নজরুল ইসলাম

[কবি-পরিচিতি—কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেশাত্মবোধক কবিতা এবং ধর্ম ও সমাজের কুসংস্কার ও ক্ষতিকর আচার-বিচারের বিরুদ্ধে জেহাদী কবিতা লিখে ইনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। দেশের কাজে তাঁকে কারাবাসও করতে হয়েছিল। অজস্র গান তিনি রচনা করেছেন, সেগুলিতে সুরও দিয়েছেন। তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষরে 'নজরুল-গীতি' নামে সেগুলি বাংলা গানে একটা যুগ সৃষ্টি করেছিল। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট', 'বুলবুল' প্রভৃতি তাঁর জনপ্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। নিচের কবিতাটি একটি নিছক পল্লীচিত্র।]

অমর-কানন এ যে অমর-কানন
বন কে বলে রে ভাই, এ যে তপোবন।
এর দক্ষিণে গিরিনদী কুলুকুলু বয়,
তার কূলে কূলে শাল-বীথি, ফুলে ফুলময়,
হেথা ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিনা মলয়,
মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন।

ওই দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
কিবা দুধ-হাসি হাসে হেথা কচি দুব্ ঘাস,
আর, উপরে মায়ের মতো চাহিয়া আকাশ,
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ।
মোরা নিজহাতে মাটি কাটি নিজে ধরি হাল,
সদা খুশি-ভরা বুক হেথা, হাসি-ভরা গাল,

মোরা বাতাস করি যে ভেঙ্গে হরীতকী-ডাল,
শাখায় শাখায় পাখি, গানের মাতন।
হেথা ক্ষেত-ভরা-ধান নিয়ে আসে অঘ্রাণ,
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল, হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ।
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান।
তাঁরি সাথে মোরা সবে খেলি অনুক্ষণ।

মোরা বটতলে বসি করি রামায়ণ পাঠ,
হেথা আমাদের পাঠশালা, চাষী-ভরা মাঠ,
মরি! গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট,
ঘরে ঘরে ভাই-বোন বন্ধু-স্বজন।

Characteristics of an Indian village.

অনুশীলনী

১। নিজের ভাষায় পল্লীর চিত্রটি বর্ণনা কর।

২। "রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান।" বলতে কি বোঝাতে চাওয়া হয়েছে?

৩। লিঙ্গ-পরিবর্তন কর :—

ভগবান ; বন্ধু।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—

দক্ষিণ ; খুশি ; ভরা।

৫। শব্দার্থ দাও :—

অমর-কানন ; ধেনু ; অনুক্ষণ ; মলয় ; উচাটন ; বেণু-বাজা।

৬। ব্যাখ্যা কর :—

"হেথা ক্ষেত-ভরা-ধান......ফুলে ফোটে প্রাণ।"
"মরি ! গাঁয়ে গাঁয়ে..............বন্ধু-স্বজন।"

৭। অর্থের দিক দিয়ে পার্থক্য জেনে রাখ :—

বন্ধু/স্বজন ; বীথি/বন।

আবোল তাবোল

—সুকুমার রায়

[কবি-পরিচিতি—জন্ম (১৮৮৭, মৃত্যু ১৯২৩) আদিনিবাস ময়মনসিংহ ; স্থায়ী নিবাস কলিকাতা। বিখ্যাত চিত্রকর ও মুদ্রাকর এবং শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ-পুত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এস্-সি পাস করে, লণ্ডন থেকে এফ-আর-পি-এস্ উপাধি-আনেন। আলোক-চিত্র বিশারদ ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি অপূর্ব রস-রচয়িতা বলে অমর হয়ে আছেন। তার আগে সূক্ষ্ম অনাবিল হাস্যরস আমাদের দেশে বিরল ছিল, যদিও ব্যঙ্গ-রচনা যথেষ্ট ছিল। সংস্কৃতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য নানা বিষয়ে ইংরিজিতে ও বাংলায় কয়েকটি অপূর্ব প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আশ্চর্য সরস ছবি আঁকতে পারতেন। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করায় একটি মাত্র বই প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন। সেটির নাম "আবোল তাবোল" ; বইখানির অপূর্ব ছবিগুলিও তাঁরই আঁকা। এই কবিতাটি ঐ বইয়ের শেষ কবিতা। তাঁর জীবনেরও সম্ভবতঃ শেষ কবিতা। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরে তাঁর যোগ্য পুত্র সত্যজিৎ রায় তাঁর অন্যান্য রচনার বেশির ভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন।

এই কবিতাটি লেখক মর্মান্তিক রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে লিখেছিলেন। শেষ দুটি লাইন তাই বড়ই বেদনাদায়ক। এর অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই কবিতাতে তিনি তাঁর রস-রচনা সম্বন্ধে একান্ত নিজস্ব মূল কথাটি বলে গেছেন। অর্থাৎ রস-রচয়িতা সর্বদা তাঁর মনের কথা, তাঁর কল্পনার কথাই বলে যাবেন, অন্য লোকে না বুঝলেও তিনি থামবেন না।]

মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।

হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশ-তলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরনা ছোটে,
আকাশ-কুসুম আপনি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন,
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক,
নাইবা বুঝুক বেবাক লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে
ছুটলে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে—
রাম-খটাখট ঘ্যাচাং-ঘ্যাচ
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত।
হ্যাংলা হাতি চ্যাং দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।

ম ক্ষি রা ণী   প ক্ষি রা জ
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

অনুশীলনী

১। কবির মনের কথা তোমার ভাষায় বল।

২। "হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা"—কোথায়? সেখানে কি হয়?

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

"রাম — — ঘ্যাচ
কথায় — কথার —।
— ঢাকা —,
ঘণ্টা— — তার।"

৪। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—

রাত ; অন্ধকার ; লক্ষ্মী ; সাঙ্গ।

Some beautiful nonsense.

মা আমার

— কামিনী রায়

[কবি-পরিচিতি — কামিনী রায় (১৮৬৪ — ১৯৩৩) নিবাস বাসণ্ডা, বরিশাল। ৮ বৎসর থেকে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৬ সালে বি-এ পাস করে বেথুন স্কুলে শিক্ষিকা হন। ১৮৯৪ সালে সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁর নাম-করা কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'গুঞ্জন', 'অশোক সংগীত', দীপ ও ধূপ', 'জীবনপথে' প্রভৃতি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান। এই কবিতাটি 'আলো ও ছায়া' থেকে সংকলিত। মাতৃভূমিকে জননীরূপে কল্পনা করে কবি দেশপ্রেমমূলক এই কবিতাটি লিখেছেন।]

যেই দিন ও-চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুখিনী জনমভূমি — মা আমার, মা আমার !

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোটখাটো সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ—মা আমার, মা আমার !

অতীতের কথা কহি বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোনো গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে—মা আমার, মা আমার !

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে।
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে!
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক প্রাণ, যাক প্রাণ—মা আমার, মা আমার!

অনুশীলনী

১। এ কবিতা কার উদ্দেশ্য রচিত হয়েছে?
২। কবি কিভাবে দেশের সেবা করতে চেয়েছেন?
৩। "অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে" —এ কথাগুলির মানে বুঝিয়ে বল।
৪। পদ-পরিবর্তন কর:—নিয়োজিত।
৫। লিঙ্গ-পরিবর্তন কর:—দুখিনী।
৬। বিপরীতার্থক শব্দ দাও:—হাসি; বিসর্জন; অতীত।
৭। শব্দার্থ দাও:—অনিবার; ডালি; নিয়োজিত; কলঙ্কভার; বিষাদময়।
৮। ব্যাখ্যা কর:—"অনল পুষিতে……মা, আমার!"
"অতীতের কথা……মা, আমার!"
"মরিব তোমারি……মা, আমার!"
৯। শূন্যস্থানগুলি কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা পূরণ কর:—
(ক) তিনি দেশজননীর চরণে সর্বস্ব — দিয়াছিলেন এবং সকল রকম সুখ — দিয়াছিলেন।
(খ) বর্ষার নদী — গতিতে বহিয়া চলে।
(গ) কাজের চাপে তাঁহার আর — নাই।
১০। কোন্‌টি বিশেষ্য ও কোন্‌টি বিশেষণ তাহা বল:—
দুখিনী জনমভূমি; ছোটখাটো সুখ দুঃখ; বিষাদময় এ জীবন।

Love for the motherland.



কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

[কবি-পরিচিতি—মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর কবি। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনার জন্য ইনি বিখ্যাত হন এবং কবিকঙ্কণ উপাধি লাভ করেন। কাব্য-রচনায় তিনি সেই সময়কার প্রচলিত বাংলা শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান আছে; কাব্যের মাধ্যমে আখ্যান-রচনায় তিনিই পুরোধা।

'কালকেতু' 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেরই অংশ। কাব্যের নায়ক কালকেতুর বালক বয়সের কথা এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।]

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু
বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি
সবার লোচন-সুখ-হেতু ॥
নাক মুখ চক্ষু কান, কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।
গুণ শীল রূপ বাড়া বাড়ে যেন শাল কোঁড়া
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল ॥
বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁঠি,
করযুগে লোহার শিকলি।
বুক শোভে ব্যাঘ্র-নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে,
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী ॥
কপাট-বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মুক্তাপাঁতি জিনিয়া দশন ॥

দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা
কানে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল।
পরিধান বীর-ধড়ী, মাথায় জালের দড়ি,
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল॥
লইয়া ফাউড়া ডেলা, যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আঁকড়ি ধরে, পড়য়ে ধরণী 'পরে,
ডরে কেহ নিয়ড়ে না রয়॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, তাড়িয়ে শশারু ধরে,
দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়ে বান্ধে,
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥

অনুশীলনী

১। নিজের ভাষায় কালকেতুর বর্ণনা দাও।

২। সমবয়সী বালকদের মধ্যে কালকেতুর স্থান কিরূপ ছিল, এবং কেন ছিল?

৩। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখ্যানটি সংক্ষেপে জেনে নাও।

৪। এই কয়টি শব্দ এবং অর্থ মনে রাখ :—
কাঁঠি—মাছ ধরবার জালে লাগানো থাকে, লোহার গুলি। নাটা—গোলাকার ফল, করঞ্জা। ভাঁটা—গোলক। বীর-ধড়ী—'ধড়ী' অর্থে ধুতি। 'বীর-ধড়ী' অর্থে মালকোছা-বাঁধা কাপড়। ফাউড়া—দণ্ড, খেঁটে-লাঠি। নিয়ড়ে—নিকটে। শশারু—খরগোস। বাঁটুল—গুল্‌তি বা ধনুক দিয়ে ছোঁড়বার শক্ত গুলি।

৫। পদ-পরিবর্তন কর :—গুণ; বিচিত্র; পরিধান।

৬। লিঙ্গ-পরিবর্তন কর :—বিহঙ্গ।

৭। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :—গুণ; বিশাল; নিন্দা।

৮। শব্দার্থ লেখ :—রতিপতি; কুন্দে; শাল-কোঁড়া; কুন্তল; ত্রিবলী; আকর্ণ-আয়ত; মণ্ডল; ইন্দীবর; ছুবায়; স্ফটিক; কেশরী।

৯। ক্রিয়াপদের এই প্রাচীন রূপগুলি লক্ষ্য কর :—বিন্ধে; আইসে।

১০। ব্যাখ্যা কর :— "শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল।"
"ডরে কেহ নিয়ড়ে না রয়।"

A: Nice description of a rustic bo



পথের পাথর

কৃষ্ণদয়াল বসু

[কবি-পরিচিতি—স্বর্গীয় কৃষ্ণদয়াল বসু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ছোটদের জন্য বেশ কয়েকটি স্মরণীয় কবিতা তিনি লিখে গেছেন। বড়দের কবিতা, অতি সামান্ত লিখলেও, গুণীজনের প্রশংসা পেয়েছিল।]

পথের মোড়ে ছিল পড়ে প্রকাণ্ড এক পাথর ;
কত কালের কেউ না তাহা জানে ;—
হুঁচোট খেয়ে পড়ত সবাই,—সরিয়ে দিতে কাতর ;—
এমন কাণ্ড দেখেছ কোন্‌খানে ?
আঁধার রাতে আছাড় খেয়ে তর্কবাগীশ মশাই
অতর্কিতে ভাঙলেন ডান হাত ;
বাঁ হাতখানা মচকালে এক রাতকানা কোন গোঁসাই,
—গাঁয়ের লোকের নেই তবু দৃক্‌পাত।
চৌধুরীদের বড়বাবু নিত্য জুড়ি হাঁকায় ,—
উল্টে গাড়ি জখম হলো ঘোড়া ;
ধাক্কা লেগে গোফুর শেখের গোরুর গাড়ির চাকায়
নতুন গোরুর একটা হলো খোঁড়া।

ছোট-বড় এমনতর আপদ-বিপদ সবার
ঘটলো কত নেইকো লেখাজোখা,—
পথের আপদ সরিয়ে শেষে নিষ্কণ্টক হবার
করলো উপায় এক চাষী একরোখা।
শক্ত সবল দুটি হাতে পাথরখানা ধরেই
বিপুল বলে দিল বিষম টান,
পথ ছাড়িয়ে দুহাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়েই
কঠিন পাথর নিমেষে খান্ খান্।
অবাক চোখে দেখলে চাষী, সেই পাথরের তলায়
মোহর-ভরা আছে সোনার ঘড়া।
বিস্ময়ে আর উল্লাসে তার স্বর সরে না গলায়,—
বিধির সে দান মাথায় নিল ত্বরা।
সেই কলসের গায়ে লেখা—'ধরায় যারা অলস,
তাদের জীবন কেবল বোঝার ভার;
পথিক, তুমি পরিশ্রমী, লও এ সোনার কলস,—
কঠিন শ্রমের এই তো পুরস্কার।'

অনুশীলনী

১। কবিতাটির আসল বক্তব্য কি?

২। পাথরের জন্য যে সব দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তার বিবরণ দিয়ে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

৩। ঘড়ার গায়ে কি লেখা ছিল? কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে তার মিল কতটা?

৪। পদ-পরিবর্তন কর :—পরিশ্রমী; চাষী; বিস্ময়; অলস।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—অলস; প্রকাণ্ড; সবল; কঠিন; পুরস্কার।

৬। শব্দার্থ দাও :—ত্বরা; দৃক্পাত; নিমেষ; বিধি।

৭। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর : নিষ্কণ্টক; বাগীশ।

৮। টীকা লেখ :—তর্কবাগীশ; গোঁসাই।

৯। ব্যাখ্যা কর :—"ধরায় যারা অলস……এই তো পুরস্কার।"

১০। 'অলস'; 'কাতর'; 'পরিশ্রমী' এবং 'পুরস্কার'—এই শব্দগুলি ব্যবহার করে বাক্য রচনা কর।

Prize for diligence

কিছু না

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[কবি-পরিচিতি—দ্বিজেন্দ্রলালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'প্রতাপ ও শক্তসিংহ' নাট্যাংশে দেখে নাও। 'কিছু না' হাসির গানটি তাঁর 'কল্কি-অবতার' প্রহসনের জন্য লেখা হয়, পরে একটু বাদ দিয়ে 'হাসির গান' সঙ্কলন-গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়। জীবনকে ভরিয়ে তুলতে হলে কি ধরনের মনোভাব নিতে হয়, এই কবিতায় সেই কথাই বলা হয়েছে।]

নাঃ!—এ জীবনটা কিছু নাঃ!
শুধু একটা "ইঃ" আর একটা "উঃ"
আর একটা "আঃ"!
এ ছাড়া জীবনটা কিছুই নাঃ!
সবই বাড়াবাড়ি,
আর তাড়াতাড়ি,
আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি;
এ সব ক'রো নাক, খাসা ব'সে থাক,
ভায়া, ছড়িয়ে দিয়ে পা;
—আর, বল জীবনটা কিছু নাঃ।
কেন চটাচটি; আর রোষারোষি,
আর গালাগালি, আর দোষাদোষি?
কর হাসাহাসি, ভালবাসাবাসি,
আর, ব'সে গোঁফে দাও তাঃ,—

ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ'।
—নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

এত বকাবকি, চোখ রাঙ্গারাঙ্গি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড় ভাঙ্গাভাঙ্গি,
প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই ঢাই'—
আর সদাই 'বাপরে মাঃ';
ছেড়ে কিচিমিচি, আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুমুহু 'হায় উহু উহু',
প্রাণের সার যাহা—কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ;
—তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

অনুশীলনী

১। কবির কাছে জীবনটা 'কিছু না' বলে মনে হওয়ার কারণ কি?
২। জীবনটাকে ভরিয়ে তুলতে হলে, কি ছাড়তে হবে আর কি করতে হবে?
৩। কবিতার খাতিরে 'মুহুর্মুহু' শব্দটির রূপান্তর লক্ষ্য কর।
৪। কবিতাটিতে "উঃ", "আঃ" জাতীয় (এগুলিকে মনোভাবব্যঞ্জক অব্যয় বলে) আর যে শব্দ আছে, সঙ্কলন কর।

An Epicurean ideal to make the life fruitful.

সীতার বিলাপ

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[কবি-পরিচিতি—শ্রীমধুসূদন (১৮২৪—১৮৭৩) বাঙলা সাহিত্যে একজন যুগপ্রবর্তক। বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং 'সনেট' বা চতুর্দশপদী কবিতা প্রবর্তন করা ছাড়াও নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তিনি নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দশটি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অধিকার ছিল, এবং তাই বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ কাব্যে, ভাব, ভাষা, ছন্দ, বিষয়—সকল ক্ষেত্রেই অনায়াসে তিনি নতুন আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। নিচের কাব্যাংশটি মাইকেলের সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মেঘনাদবধ'-এর চতুর্থ সর্গ থেকে নেওয়া হয়েছে। বিভীষণ-পত্নী সরমার অনুরোধে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হবার সময়কার দুর্দশার কথা বর্ণনা করেছেন।]

"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি ;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছট্‌ফটি
ভাঙ্গিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু সুন্দরি !
হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী !
হে সমীর ! গন্ধবহ তুমি ; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেণ প্রভু ! হে বারিদ, তুমি

হে ভ্রমর, মধুলোভী, ছাড়ি ফুলকুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চ-স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু, তুমি হে, গাইলে!
এইরূপে বিলাপিনু ;—কেহ না শুনিল!"

অনুশীলনী

১। 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পার?
২। অসহায়া সীতা কাদের কাছে কোন কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন?
৩। সীতার অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা কর এবং সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে সেই অসহায় অবস্থা কেমনভাবে ফুটেছে, বুঝিয়ে দাও।
৪। পদ-পরিবর্তন কর :—শৃঙ্খল ; আনন্দ।
৫। লিঙ্গ-পরিবর্তন কর :—বিজয়ী ; কোকিল ; সুন্দরী ; দাসী।
৬। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—আনন্দ ; ভাঙ্গা ; ত্বরা।
৭। শব্দার্থ দাও :—নিষাদ ; শব্দবহ ; ঘোররব ; চূড়ামণি ; সমীর ; গন্ধবহ ; বারিদ ; ভীমনাদ ; নিনাদ ; নিকুঞ্জ ; বারতা ; মধু-সখা।
৮। শব্দগুলির গদ্যরূপ দাও :—কাঁদিনু ; আরাধিনু ; বরিনু ; ভ্রমেণ। গুঞ্জর ; বিলাপিনু।
৯। ব্যাখ্যা কর :—"হে আকাশ……ভুবনবিজয়ী।"
"হে সমীর………ভ্রমেণ প্রভু।"
"এইরূপে বিলাপিনু ; কেহ না শুনিল!"

Lamentation of Sita when She was kidnapped by Ravana



—রজনীকান্ত সেন

[কবি-পরিচিতি—রজনীকান্ত (১৮৬৫—১৯১০) প্রধানতঃ গান হিসাবে পদরচনা করলেও তাঁর রচনার কাব্যমূল্যও কম নয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'—এই বিখ্যাত গানটি রচনা করে তিনি সারা বাঙলায় 'কান্তকবি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর সঙ্গীত ও কবিতাপুস্তকের মধ্যে দুটি শিশুপাঠ্য নীতি-কবিতার সঙ্কলন আছে। নিচের কবিতাটি 'বানী' গীতিগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায় এই সৃষ্টিরহস্যের কত অল্পই না সন্ধান বা সমাধান মেলে, এই কবিতায় কবি সেই কথাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।]

ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে ;
দেখ্‌বো সে উপাধি নিলে,
　　　　ক'টা 'কেন'র জবাব শিখে।
ধরা কেন কেন্দ্র পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা-ছেঁড়া ফল কেন সে,
　　　　দেয় না যেতে অন্য দিকে ?
কোকিল কেন কুহু বলে, জোনাকীটে কেন জ্বলে,
রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির মিলে
　　　　কেন ফুটায় কুসুমটিকে ?
চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে ;
চকোরে চায় চন্দ্রমাকে,
　　　　কমল কেন চায় রবি

বায়ু কেন শব্দ বহে, অনল-শিখা কেন দহে,
চুম্বক কেন লৌহে টানে,
টানে না মণিমাণিকে ?
ইক্ষু কেন সুরস এত, নিমটে কেন এমন তেতো,
ময়ূর কেন মেঘের ডাকে
মেলে মোহন পুচ্ছটিকে ?
কান্ত বলে, আছে জেনো, 'কেন'র 'কেন', তস্য 'কেন'
যাও, নিখিল 'কেন'র মূল কারণে,
সে রেখেছে কালের খাতায় লিখে।

অনুশীলনী

১। 'কেন'র 'কেন', তস্য 'কেন'—বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

২। কি করে হয়—বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমরা প্রধানতঃ তারই জবাব পাই। মূল 'কেন'র জবাব পাই কি ? বুঝিয়ে বল।

৩। কোন কোন প্রশ্ন কবি জিজ্ঞাসা করতে চান ?

৪। পদ-পরিবর্তন কর :—বৈজ্ঞানিক ; কেন্দ্র ; মিষ্টি ; মূল।

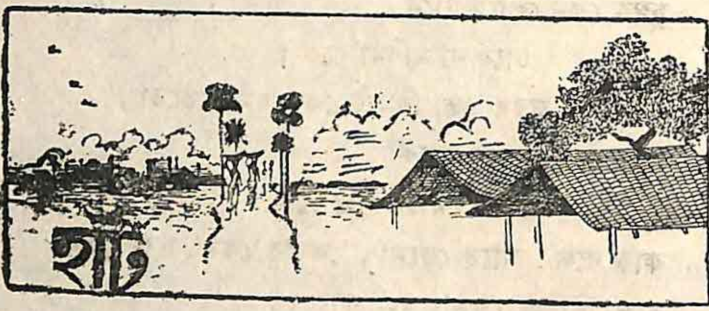
৫। লিঙ্গ-পরিবর্তন কর :—কোকিল ; চাতক ; চকোর ; ময়ূর।

৬। শব্দার্থ লেখ :—উপাধি ; মাগে ; চন্দ্রমা ; ইক্ষু ; অনল ; পুচ্ছ ; মোহন ; নিখিল ; তস্য।

৭। ব্যাখ্যা কর :—(ক) "দেখ্‌বো সে উপাধি······জবাব শিখে।"
(খ) "কান্ত বলে···············খাতায় লিখে।"

৮। টীকা লেখ :—উপাধি ; ধরা কেন···টানে ; কালের খাতা।

Every question has its answer



—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[কবি-পরিচিতি—(জন্ম ১৮৮৭, মৃত্যু ১৯৫৪)। পিতৃনিবাস শান্তিপুরের নিকট হরিপুর। এফ-এ পাশ করে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েন। ১৯১১ সালে বি-ই পরীক্ষায় পাশ করে নদীয়া জেলা বোর্ডের অধীনে কাজ নেন। পরে কাসিমবাজার রাজ এস্টেটের এঞ্জিনিয়ার হন। অবসর নেবার পর বেশি দিন বাঁচেন নি।

যতীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই দক্ষ ছিলেন। ভাবে, ভাষায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে ও ভাষার অলঙ্কারগুণে তাঁর রচনা অসাধারণ ও মৌলিক। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম', ইত্যাদির নাম করা যায়। তাঁর কাব্যরস বিচারের বইয়ের নাম 'কাব্য-পরিমিতি'। ইংরিজি ও সংস্কৃত থেকে কিছু রচনা অনুবাদ করেছিলেন। এই কবিতাটি 'মরীচিকা' থেকে নেওয়া হয়েছে। কবি হাটের বর্ণনা দিয়ে তার মধ্যে জগৎ-সংসারের ছবি দেখতে পেয়েছেন।]

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি, মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
    বেচা-কেনা সেরে বিকালবেলায়
    যে-যাহার সবে ঘরে ফিরে যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পূবের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ, আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস পার্শ্বে পাকুর শাখে।
হাটের দো-চালা মুদিল নয়ান ,
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ-বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল চেনা-অচেনার ভিড়ে ;
কত-না ছিন্ন চরণচিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল-চেনাচিনি , দর-জানাজানি ,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি করে কেউ নিল ভরে , কেউ গেল খালি ফিরে ;
দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত কে আসিল, কত বা আসিছে, কত না আসিবে হেথা ;
ওপারের লোক নামালে পসরা ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল
শত হাতে সহি পরখের ছল
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহিরে—এল আর গেল কত ক্রেতা-বিক্রেতা।
নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা ;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী নিত্য নাটের খেলা।
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে ,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে ,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা !

অনুশীলনী

১। কবিতার অনুসরণে নিজের ভাষায় হাটের দুই বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা দাও।

২। ভাঙা হাটের শূন্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি রাত্রি নামার যে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, তা নিজের ভাষায় লেখ।

৩। কবিতার শেষ পংক্তি কয়টিতে কবি "নিত্য নাটের খেলা" বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?

৪। পদ পরিবর্তন কর :—ক্ষয় ; ভক্ত।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—
দূরে ; আলোক ; নিশা ; অন্ত ; নীরব ; ভাঙা ; উদার ; মুক্ত।

৬। শব্দার্থ দাও :—
শ্রেণীহারা ; আহ্বান ; বিদ্রূপ-বাঁশী ; জীর্ণ ; অস্থি ; নাট ; পসরা।

৭। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—নির্জন ; প্রেমানন্দ।

৮। টীকা লেখ :—
কানাকড়ি ; দোচালা ; ত্রিভুবন।
"বাজে বায়ু……বাঁশের ফাঁকে।"
"নিত্য নাটের খেলা!"

৯। ব্যাখ্যা কর :— (ক) "বকের পাখায়……থাকে হাট।"
(খ) "নিশা নামে……কাকের ডাকে।"
(গ) "শিশির-বিমল……নীরব ব্যথা।"
(ঘ) "নূতন করিয়া……নাটের খেলা!"
(ঙ) "কেহ কাঁদে……একই খেলা!"

Description of a village market.

বাঙলার যমুনা



—প্রমথ চৌধুরী

[কবি-পরিচিতি—বিখ্যাত 'সবুজ পত্র'-এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮—১৯৪৬) বাঙলা গদ্যরীতিতে নতুন যে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী এনেছিলেন, তা 'বীরবলী ভাষা' হিসাবে পরিচিত। 'বীরবল' ছদ্মনামেই তিনি প্রসিদ্ধ। সমালোচনা, প্রবন্ধ, গল্প এবং অন্যান্য গদ্যরচনা ছাড়াও তিনি কয়েকটি 'সনেট' বা চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন। নিচের কবিতাটি 'সনেট-পঞ্চাশৎ' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কবিতায় পূর্বভারতের (বর্তমানে বাঙলা দেশের) যমুনার প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে।]

তুমি নহ শ্যামা তন্বী বৃন্দাবন-পাশে,
তীরে যার সারি সারি কদম্ব বকুল,
কৃষ্ণ যেথা বেণুতানে মাতায় গোকুল,
নৃত্য করে লীলাভরে গোপীসনে রাসে।

উজান বহ না তুমি চলিয়া বিলাসে,—
সুমুখে ছুটিয়া চল উদ্দাম ব্যাকুল,
মাটি নিয়ে খেলা কর, ভেঙ্গে দুটি কূল,
সীমায় আবদ্ধ নহ, পরশ' আকাশে!

আরম্ভেতে ব্রহ্মপুত্র, শেষেতে যমুনা।
সৃষ্টি আর প্রলয়ের দেখাও নমুনা।
অহর্নিশ ভাঙ্গাগড়া, এই তব রীতি,
মুক্তকণ্ঠে গাও তুমি জীবনের গান।

জগৎ গতির লীলা, সৃষ্টিছাড়া স্থিতি।
বাঙলার নদী তুমি, বাঙলার প্রাণ!

অনুশীলনী

১। বৃন্দাবনের যমুনা আর বাঙলার যমুনার রূপ এবং প্রকৃতির তুলনা কর।

২। ভৌগোলিক দিক থেকে দুই যমুনার উৎপত্তি এবং গতি-প্রকৃতি জেনে রাখ।

৩। 'সৃষ্টি আর প্রলয়ের দেখাও নমুনা'—কেন বলা হল?

৪। কবিতাটি পড়ে 'সনেট' বা চতুর্দশপদী কবিতার কোন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পেরেছ?

৫। পদ পরিবর্তন কর :—

ব্যাকুল ; স্থিতি ; বিলাস।

৬। লিঙ্গ-পরিবর্তন কর :—

শ্যামা ; গোপী ; নদী।

৭। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—

উজান ; আরম্ভ ; সৃষ্টি।

৮। শব্দার্থ বল :—

তন্বী ; বেণুতানে ; উজান ; উদ্দাম ; ব্যাকুল ; অহর্নিশ ; মুক্তকণ্ঠে ; স্থিতি।

৯। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—

অহর্নিশ।

১০। ব্যাখ্যা কর :—

"অহর্নিশ······বাঙলার প্রাণ।"

১১। টীকা লেখ :— গোকুল ; রাস ; উজান ; আরম্ভেতে ; ব্রহ্মপুত্র ; শেষেতে যমুনা।

Characteristics of Jamuna —



মন্দোদরীকে শ্রীরামের বরদান

—মহাকবি কৃত্তিবাস

[কবি-পরিচিতি—কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়) নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ—মতান্তরে পঞ্চদশ—শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙলায় রামায়ণ রচনার জন্য 'মহাকবি' রূপে পরিগণিত। বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের নিছক অনুবাদ না-করে কৃত্তিবাস তাকে নতুনভাবে, নতুনরূপে এবং নতুন নতুন ঘটনার সন্নিবেশে বাঙালীর প্রাণের মত করে সরল পদ্যে পরিবেশন করেছেন। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' তাই প্রায় মৌলিক রচনার মর্যাদা পায়। রাবণ-নিধনের পরবর্তী যে ঘটনাটি নিচের কাব্যাংশে বিবৃত হয়েছে, তার মধ্যেও ঘটনা-সন্নিবেশে কবির মৌলিকত্বের নিদর্শন রয়েছে।]

সংসার অসীমা যাঁহার মহিমা
শুনেছ ময়দানব।
যার শক্তিশেলে ত্রিভুবন টলে
লক্ষ্মণের পরাভব ॥
তাঁহার নন্দিনী রাবণ-ঘরণী
নাম মম মন্দোদরী।
এলেম চরণ করিতে দর্শন
ত্যজিয়ে যে অন্তঃপুরী ॥
স্বর্গের ঈশ্বর দেব পুরন্দর
তারে যে বান্ধিয়া আনি।

সেই ইন্দ্রজিত দেবে মানে ভীত
আমি যে তার জননী ॥
জন্মএয়ো করি বর দিলে হরি
এ বচন নহে আন ।
স্বামী এই হত আমার আয়ত্ত
কি রূপে কর বিধান ॥
তুমি সত্যবাদী ওহে গুণনিধি
মিথ্যা নহে তব বাণী ।
দারুণ প্রহারে মারিয়া পতিরে
কি কথা কহ আপনি ॥
সূর্যবংশে জাত প্রভু রঘুনাথ
কহেন হয়ে লজ্জিত ।
সত্য মোর কথা রাবণের চিতা
জ্বালিয়া রাখ আয়ত ॥
শুন মন্দোদরি যাহ নিজপুরী
মনে না কর বিলাপ ।
মম হস্তে মরে গেল সে অমরে
খণ্ডিয়া সকল পাপ ॥
শুন মোর বাণী গৃহে যাও রাণী
দুঃখ না ভাবিহ চিতে ।
রাবণের চিতা রহিবে সর্বথা
চিরকাল রবে আয়তে ॥
রামের বচনে সুখী হয়ে মনে
গৃহে যায় ততক্ষণ ।
লংকাকাণ্ড-গীত ভাষা সুললিত
কৃত্তিবাস-বিরচণ ॥

[রাবণের যে শক্তিশেলে লক্ষ্মণ নিহত হন, তা মন্দোদরীর পিতা ময়দানবের তৈরি। সামাজিক প্রথানুযায়ী চিতা সম্পূর্ণ নিভে না যাওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পত্নী এয়োতির (সধবার) চিহ্ন ধারণ করে থাকতে পারেন।]

অনুশীলনী

১। মন্দোদরী কিভাবে রামচন্দ্রের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন ?

২। নিজের ত্রুটি বুঝতে পেরেও রামচন্দ্র তাঁর বরের সার্থকতা অক্ষুণ্ণ রাখলেন কি করে ?

৩। নিচের শব্দ কয়টি যে যে অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা জেনে রাখ : —
ভীত—এস্থলে 'ভয়' ; আন—অন্যথা, ব্যতিক্রম ; আয়ত—দীর্ঘ, দীর্ঘস্থায়ী, অথবা সধবাত্ব ; আয়তে—সধবা ; ততক্ষণ—তারপর, তখন ; আয়ত্ব—সধবাত্ব।

৪। পদ-পরিবর্তন কর :—
প্রহার ; জাত ; পাপ ; ভীত ; প্রণাম ; মৃত ; বিধান।

৫। লিঙ্গ-পরিবর্তন কর :—
নন্দিনী, জননী, পণ্ডিত।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ দাও :—
আশীর্বাদ ; অসীম ; দেব ; পাপ।

৭। শব্দার্থ দাও :—
পরাভব ; ইন্দ্রজিত ; পুরী।

৮। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :—
মন্দোদরী ; আশীর্বাদ।

৯। টীকা লেখ :—
ময়দানব ; শক্তিশেল ; মন্দোদরী।

১০। সদ্য মৃতের স্ত্রীকে কতক্ষণ পর্যন্ত সধবা বলে স্বীকার করা হয় ?

Ramacandra's favour to Mandc



—জীবনানন্দ দাশ

[কবি-পরিচিতি—জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কবি পরিবেশ ও প্রকৃতির বদলের সঙ্গে একটি বিড়ালের বিভিন্ন অবস্থা আর মেজাজকে একসূত্রে গেঁথেছেন।]

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয়;
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে ;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর সাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি ;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে চলেছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
সাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

Nature and environment have been compared to

অনুশীলনী

১। বিড়াল সমস্ত দিন কি করে কাটিয়েছে? ২। 'সারাদিন সূর্যের পিছনে চলেছে সে'—ব্যাখ্যা কর। ৩। 'অন্ধকারকে…ছড়িয়ে দিল'—বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? ৪। বিপরীতার্থক শব্দ দাও:—সফলতা ; নিমগ্ন ; অন্ধকার। ৫। এই শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা কর:—নিমগ্ন, সফলতা। ৬। কোন্‌টি বিশেষ্য ও কোন্‌টি বিশেষণ তাহা বল:-বাদামী পাতা, সাদা মাটি, কৃষ্ণচূড়া, জাফরান-রঙের সূর্য্যের নরম শরীরে।